মৌন মুখর সেলুলার জেল

সত্যেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার

কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক ঃ
শান্তি রঞ্জন মিশ্র
ইউনাইটেড প্রিন্টার্স
৩০২/২/এইচ/৫, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

১

লেখকের কথা

"আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা" বইটিতে সেল্লার জেলের অভিজ্ঞতার কথা এসেছে প্রসঙ্গক্রমে। সেখানে যেটুকু লিখেছি, তা সমগ্রের ভগ্নাংশমাত্র। ঐ বইটি লেখা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৃহত্তর পট-ভূমিতে। প্রধান বিষয় হলো, জাতীয় মুক্তির সঠিক পথের সন্ধানে ঐ যুগের বিপ্লবী তরুণদের সামনে যেসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সেগুলিকে ফুটিয়ে তোলা। এই কাঠামোর মধ্যে তথ্য অবশ্যই এসেছে, কিন্তু প্রাধান্যলাভ করেছে তত্ত্ব।

অনেক বন্ধু অনুরোধ করেছিলেন, তত্ত্ব বা রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে সেল্লার জেলের জীবনের যতটা সম্ভব সামগ্রিক চিত্র যেন ফুটিয়ে তুলি। রাজনীতি এড়িয়ে নিশ্চয়ই নয়, বিতর্ক এড়িয়ে। বিতর্কের ঊর্ধ্বে সব দলমতের বিপ্লবী বন্দীদের সেদিন একটা অভিন্ন পটভূমি ছিল মাতৃভূমির শৃংখলমোচন, বিদেশী শাসনের অবসান। সেল্লার জেলের জীবনের শুরু সংগ্রাম দিয়ে, সমাপ্তি সংগ্রাম দিয়ে সেই অভিন্ন শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে। দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, চিন্তাভাবনা, ইত্যাদিরও একটা মিলিত ভিত্তি নিশ্চয়ই ছিল। একই পরিবেশে দিনের পর দিন বাস করায় এমন অনেক কিছু ছিল, যা মূলতঃ একই ধরনের। ব্যক্তির নিভৃত মনের ভাবনা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতেও যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি অনেক কিছু আছে, যা সকলের বেলাতেই প্রযোজ্য। সেই দিকগুলি কৌতূহলী পাঠক-পাঠিকাদের উৎসুক দৃষ্টির সামনে তুলে ধরতে আপত্তি কি?

কথাটার যুক্তিযুক্ততা অস্বীকার করতে পারি নি। আপত্তি ত নেই, বরং প্রয়োজন খুবই আছে। বিশেষতঃ স্বাধীনোত্তর ভারতের নতুন প্রজন্ম এবিষয়ে কিছুই জানে না। জানতে চায় অনেক কিছু। এতদিন কাজটিতেও হাত দিতে পারি নি নানা কারণে। আর একটা বড় অসুবিধাও ছিল। বহু বছর আগে পিছনে ফেলে আসা বন্দীজীবনের দিনগুলির স্মৃতি অনেকাংশে ঝাপ্সা হয়ে এসেছিল। ছোট বড় ঘটনাগুলির এক এক টুকরো এক এক সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে

মনের রুপালী পর্দায় ভেসে উঠেছে। যখন চেষ্টা করেছি, তার সূত্র ধরে মানসপটে একটা ধারাবাহিক কাহিনী ফুটিয়ে তুলতে, তখন প্রায় প্রতিপদে হোঁচট খেতে হয়েছে।

অবশেষে পুরোপুরিভাবে না হলেও যতটা সম্ভব সমগ্রভাবে স্মৃতির ভগ্নাংশ-গুলিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুসংবদ্ধ কাহিনীর রুপদানের একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। প্রায় অপ্রত্যাশিতভাবেই সুযোগটা এসে গেল।

১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আমরা প্রাক্তন আন্দামান বন্দীরা পোর্টব্লেয়ার অভিমুখে যাত্রা করি। ইতিপূর্বেই আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের চীফ্ কমিশনারের সাক্ষরিত আমন্ত্রণপত্র এসেছে প্রত্যেক জীবিত প্রাক্তন আন্দামান রাজনৈতিক বন্দীর নামে। ১১ই ফেব্রুয়ারী ভারতের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এক অনুষ্ঠানে সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারকরুপে ঘোষণা করবেন। আমরা সবাই সেই সভায় যোগদানের জন্য সরকারের বিশেষ অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রিত।

সেলুলার জেল ছেড়ে এসেছিলাম ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে। ৪১ বছর পরে ফিরে চলেছি ইতিহাসের নতুন পর্বে, নতুন ভূমিকা নিয়ে। ৭ই ফেব্রুয়ারী কলকাতা থেকে জাহাজ ছেড়েছে। ১০ই বিকালে পৌঁছাই পোর্টব্লেয়ারে। সেদিন সন্ধ্যা থেকেই ওখানকার অনুষ্ঠানসূচী শুরু। ১৩ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পর্যন্ত। ১৩ই ফেরার পথে যাত্রা। ১৬ই সন্ধ্যায় কলকাতা। সবে মিলে দশটি দিন। পোর্টব্লেয়ারে তিনদিন, একসন্ধ্যা। জাহাজঘাটে পা দিতেই মনে হলো, অতীতের যবনিকা সরিয়ে স্মৃতির রাজ্যে প্রবেশ করতে চলেছি। তারপর বাকী কটা দিনই মনে হয়েছে, যেন সেই পুরানো দিনগুলিতে ফিরে গিয়েছি, যেন কোন্ যাদুমন্ত্র-বলে মনের অতলে অযত্নে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কত ছোটবড় ঘটনা মানসপটে সারি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অনুভূতির রেশগুলি আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। ফেলে আসা দিনগুলির কথা পুরোপুরি সবটা না হলেও অনেকখানি প্রাণবন্ত হয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমার বরাবরের লেখার ধরনটা এবার পাল্টে দিচ্ছি, মনের লাগাম শিথিল করে দিয়েছি। পূর্বপরিকল্পিত ছক্ অনুসরণের বদলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা সামনে এসেছে, তাকেই লেখনীর মুখে রুপ দিয়েছি। এতে হয়তো ছবিটির জায়গায় জায়গায় ফাঁক থেকে গিয়েছে। তবু কষ্টকল্পনার আড়ষ্টতাকে এড়িয়ে চলেছি।

যারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, এবং সেলুলার জেলের অতীত সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানতে আগ্রহী, তাঁদের জন্য নতুন একটা অধ্যায় সংযোজন করেছি।

আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। ১৯৩৮ সালে পোর্টব্লেয়ার থেকে ফিরে লেখায় হাত দিয়েছিলাম। বেশীদূর এগোতে পারিনি। দু'তিনটি বছর চোখের অসুখে অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য মরিয়া হয়ে লেখায় হাত দিই ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে। ততদিনে লেখা ও পড়ার ব্যাপারে কার্যতঃ দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছি। কাজটি সম্পূর্ণ করতে হয়েছে অন্যের সাহায্যে, শ্রুতিলিখন দানের মাধ্যমে। নিজের চোখে দেখে লেখা, এবং অন্যের সাহায্য নিয়ে লেখা, দুটির ভিতর অনেক তফাৎ। স্বাভাবিক ভাবেই কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গিয়েছে। সেজন্য সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখছি। বইটি প্রকাশে উদ্যোগী হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাই কে. পি. বাগ্‌চি কোম্পাণীকে, বিশেষতঃ শ্রীকনক বাগচীকে।

২

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ পরিচিতি

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মোট ৩৪৮টি ছোটবড়ো দ্বীপ নিয়ে গঠিত। মোট ভূখণ্ডের আয়তন ৮,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার। দ্বীপগুলি বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। দ্বীপগুলি হল আরাকান উপসাগরের কূল থেকে সুমাত্রার নিকটবর্তী অচীন উপকূল পর্যন্ত প্রসারিত এক পর্বতশ্রেণীর উপরের অংশ। সুদূর অতীতে প্রবল ভূকম্পনের ফলে পর্বতশ্রেণীর নীচের অংশ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। ভেসে আছে শুধু উপরের অংশগুলি।

আন্দামান এবং নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মাঝখানে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার চওড়া, এবং ৪০০ 'ফাদম্' (Fatham) গভীর খাঁড়ি ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

আন্দামান হলো ৩২৪টি দ্বীপের সমষ্টি। এর মধ্যে মাত্র ১৮টিতে লোকবসতি আছে। প্রধান গ্রুপ বা সমষ্টি 'গ্রেট আন্দামান' বা বৃহৎ আন্দামান নামে পরিচিত। এদের মধ্যে রয়েছে পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থিত পাঁচটি দ্বীপ। তাদের নামগুলি যথাক্রমে, উত্তর আন্দামান, মধ্য আন্দামান, দক্ষিণ আন্দামান, ব্রাতাং (Baratang), এবং রুটল্যাণ্ড (Rutland), উত্তর আন্দামানের একটি অংশ 'অ্যাবাডীণ'। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ২৪টি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এদের আয়তন ১,৯৫৩ বর্গকিলোমিটার। এদের মধ্যে মাত্র ১২টি দ্বীপে মনুষ্য বসতি আছে।

কলকাতা থেকে সমুদ্রপথে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব ৭৫০ "নটিক্যাল" (Nautical) মাইল। সমুদ্রযানগুলি এই হিসেবই ব্যবহার করে থাকে। সাধারণ মাইল হিসাবে দূরত্ব দাঁড়ায় ১২০০ মাইলের কিছু বেশী।

৩

ইতিহাসের উজানে

এই বইটিতে আমি লিখেছি সেলুলার জেলের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষ দুই বৎসরের কথা। লিখতে লিখতে মনে হয়েছে, এ যেন একটা বড় নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ কয়েক দৃশ্য। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তুলে ধরা না হলে গোটা লেখাটাই মনে হবে অঙ্গহীন, অসম্পূর্ণ। বিশেষ করে, যে সব পাঠক-পাঠিকা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে খুব বেশী খবর রাখেন না, তাদের কাছে অনেক কথার তাৎপর্য হয়তো ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। তাই এই সংযোজন। সেলুলার জেল তৈরীর কয়েকদশক আগে কয়েদী উপনিবেশ হিসাবে আন্দামানের পত্তন থেকে একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া প্রয়োজন। সেই ইতিহাসই হবে এই কাহিনীর উপযুক্ত পটভূমি।

কয়েদী উপনিবেশ আন্দামান

কয়েদী উপনিবেশ স্থাপনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির তাৎপর্য প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলাও প্রয়োজন। শুধু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদই নয়, ইউরোপের যে সব ঔপনিবেশিক শক্তি এশিয়া, এবং আফ্রিকার বহু দেশ পদানত করে রেখেছিল, তাঁরা সবাই অনুরূপ নীতি অনুসরণ করেছে। কয়েদী উপনিবেশ গড়ে তোলা হত পরাধীন দেশগুলির এমন সব অঞ্চলে যেখানে রয়েছে প্রাকৃতিক সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার, অথচ প্রকৃতি যেন সেখানে মানুষকে প্রবেশ করতে দিতে রাজী নয়। তার ভ্রূকুটি তুচ্ছ করে যে দুঃসাহসিক দল সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাদের সেজন্য কঠিন মূল্য দিতে হয়। সেখানকার অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুতে ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির রাজত্ব। সেইসঙ্গে বিষাক্ত সরীসৃপ, আদিম বনভূমির হিংস্রজন্তু, এবং তার চেয়েও হিংস্র আদিম মানুষ। শেষোক্তদের অবশ্য কোনও দোষ নেই। সভ্য মানুষদের কাছে তারা যে ব্যবহার পেয়েছে, তাতে তাদের মনে

অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াটাই স্বাভাবিক। সব মিলে মৃত্যুর বিভীষিকা সেখানে প্রতি পদক্ষেপে। এক যুগে এই ধরনের অঞ্চলগুলিকে মনুষ্য বসবাস এবং শোষকশ্রেণীর মুনাফা-মৃগয়ার উপযোগী করে তোলার কাজে বলি হিসাবে ব্যবহৃত হত হতভাগ্য ক্রীতদাসের দল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুসভ্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি ক্রীতদাসদের বদলে বধ্য হিসাবে কাজে লাগাত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের। বৃটিশ গভর্ণমেন্টও ব্রহ্মদেশ এবং মালয়ে অনুরূপ কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করে।

কয়েদী উপনিবেশ হিসাবে আন্দামানের একটি বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে উপনিবেশ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় ভারতের বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী-দের শায়েস্তা করার পরিকল্পনা। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সময় থেকেই আন্দামানের ইতিহাস আমাদের দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জোয়ার ভাঁটার খেলা চলেছে। কখনও তা উত্তাল হয়ে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদ তখন বল্গাছেঁড়া দমননীতির সাহায্যে তার গলা টিপে ধরতে চেয়েছে। আবার যখন জাতীয় আন্দোলনের সাময়িকভাবে ভাঁটার টান ধরেছে, বিদেশী শাসক তখন তার কৌশল পরিবর্তন করেছে। মুক্তিসংগ্রামের মধ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু প্রলোভনকে টোপ হিসাবে ব্যবহার করেছে। তখন কিছুকালের জন্য দমননীতির বজ্রমুষ্টি আপেক্ষিকভাবে শিথিল করেছে। আবার যখন জাতীয় আন্দোলনে নতুন জোয়ারের সূচনা হয়েছে, বিশেষতঃ বৈপ্লবিক সম্ভাবনা মাথা তুলেছে তখন বৃটিশ গভর্ণমেন্টের হিংস্ররূপটি আবার আত্মপ্রকাশ করেছে। নির্বাসিত বিপ্লবী বন্দীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছে।

১৭৮৯ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আদেশে ক্যাপ্টেন ব্লেয়ার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। পোর্টব্লেয়ার আজও সেই নাম বহন করছে। উদ্দেশ্য ছিল, বর্ষার বঙ্গোপসাগরে ঝড়ে বিপন্ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জাহাজগুলির জন্য একটি আশ্রয়স্থল গড়ে তোলা। আনুষঙ্গিক সুখ-সুবিধার জন্য এক কথায়, স্থানটিকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী-দের কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ম্যালেরিয়ার প্রকোপে বহু প্রাণহানি ঘটে। জঙ্গল কাটার সময়ে আদিম অধিবাসীদের বিষাক্ত তীরে অনেকের মৃত্যু হয়। মোটের উপর, সর্বদিক বিবেচনার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে। কারণ দেখা যায়, লাভের তুলনায় লোকসান অনেক বেশী।

কয়েদী উপনিবেশরূপে আন্দামানকে স্থায়ীভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু

হয় ১৮৫৮ সাল থেকে। সেজন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বধ্য হিসাবে বেছে নেয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের, অর্থাৎ ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের বীর সৈনিকদের। যাদের মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় নি, তাদের অধিকাংশকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এদের কোথায় রাখা হবে, তাই নিয়ে গভর্ণমেণ্ট দুর্ভাবনায় পড়ে। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরদের দেশের জেলে বন্ধ রাখার অনেক বিপদ। তারা অন্যান্য কয়েদীদের সংগঠিত করে বিদ্রোহ ঘটাতে পারে। বাইরের দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হলে সে বিদ্রোহ দমন সহজ হবে না। ব্রহ্মদেশ বা মালয়ের কয়েদী উপনিবেশে পাঠালে সেখানে একই সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব, এদের আন্দামানে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সব বন্দীদের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর লোক ছাড়াও কিছুসংখ্যক ছিলেন বুদ্ধিজীবী ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ, যথা জমিদার, মৌলভী ইত্যাদি। আন্দামানে নির্বাসিতদের মধ্যে এইরকম দুজনের নাম জানা যায়। একজন হলেন আল্লামা ফজলে হক্ খয়রাবাদী। ইনি ছিলেন প্রখ্যাত উর্দু কবি মির্জা গালিবের বন্ধু। বৃটিশ শাসনমুক্ত দিল্লীর জন্য ইনি একটি সংবিধান রচনা করেছিলেন। অপরজনের নাম মৌলভী লিয়াকৎ আলি। নির্বাসনে এঁদের মৃত্যু কিভাবে ঘটে সে বিষয়ে কিছু জানা যায় না।

শুধু উপরোক্ত দুইজনেই নন। প্রথম যুগের সেই সব বীর শহীদদের কথা বিস্মৃতির অতলে বিলীন হতে চলেছিল। এদের মোট সংখ্যা কত ছিল, তাও সঠিক জানা যায় না। কেউ বলেন তিন হাজার, কেউ বলেন দুই হাজার। মাত্র কয়েক জনের নাম উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত বীর সেনানীদের প্রতি জাতির ঋণ কিছু পরিমাণে শোধের জন্য এঁরা তৎপর হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রয়াত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, জাতীয় মহাফেজখানার (National Archives) সহকারী অধ্যক্ষ, ডঃ নারায়ণ এইচ. কুলকার্নি, এবং ডঃ এল. পি. মাথুরের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত জন "ভারতীয় শহীদদের পরিচিতি" (Who's Who of India Myrters) গ্রন্থে নির্বাসনে যাঁরা প্রাণ হারান, এমন কয়েকটি নাম উল্লেখ করেছেন।

নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কিরকম ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে জীবনযাপন করতে হয়েছে, সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সেগুলি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুসৃত ঔপনিবেশিক নীতির নারকীয় চরিত্রের উপর আলোকপাত করে। উক্ত নীতির দুমুখো চেহারাটিও উদ্‌ঘাটিত হয়।

এই সব বন্দীদের আন্দামানে পাঠানো শুরু হয় ১৮৫৮ সালের মার্চ মাসে।

কলিকাতা বন্দর থেকে মিঃ ওয়াকার নামে জনৈক বৃটিশ রাজপুরুষ বন্দীদের একটি দলকে নিয়ে পোর্টব্লেয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। পরে করাচী ও বোম্বাই বন্দর থেকেও জাহাজে কয়েকটি দলকে পাঠানো হয়। ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকারের প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তিতে বন্দীদের সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করা হয়ঃ—

"এরা সাংঘাতিক ধরনের রাজদ্রোহী হলেও নৈতিকতার দিক থেকে অধঃপতিত নয়। বিদ্রোহীদের মধ্যে যারা পাণ্ডা ছিল, তাদের সবাইকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, তারা অন্যের দ্বারা বিপথে চালিত হয়েছিল।"

উপরে ঘোষিত নীতি অনুসারে নির্বাসিত দেশপ্রেমিকেরা মানবিক আচরণ, এবং যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা লাভের অধিকারী ছিলেন।

কিন্তু বন্দীদের প্রতি কি ধরনের ব্যবহার করা হবে, সে সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্ট কোনও নিয়মবিধি নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে নি। ফলে কয়েদী উপনিবেশের প্রথম অধ্যক্ষ মিঃ ওয়াকার ছিল সর্বময় কর্তা। তার মর্জী, সাময়িক খেয়াল, ইত্যাদিই ছিল আইন। মনে রাখা দরকার যে, বিদ্রোহ দমনের পর বহু বৎসর পর্যন্ত বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে সন্দেহভাজন ভারতীয়দের উপর প্রতিহিংসামূলক আচরণ করা হত। বৃটিশ রাজপুরুষদের চোখে রাজবিদ্রোহীদের মত ঘৃণ্য জীব আর নেই। সুতরাং কোনরকম নিয়মবিধি নির্দিষ্ট না থাকায় নির্বাসিত বন্দীদের উপর কি ধরনের বীভৎস অত্যাচার চলতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

ওয়াকার যে জাহাজে যাত্রা করে, সেটি পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছানোর আগেই কয়েকজনের মৃত্যু হয়। কেউ বলেন ছয়জনের, কেউ বলেন চারজনের। আর বেশ কিছু সংখ্যক গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

আন্দামানে পৌঁছাবার পর বন্দীদের যে ধরনের দুঃসহ পরিবেশ, তথা কর্তৃপক্ষের ব্যবহারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তা নীচে উল্লিখিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে অনুমান করা যাবে।

● আন্দামানে পৌঁছাবার চতুর্থ দিনে নারায়ণ নামে একজন বিদ্রোহী অন্যান্য কয়েদীদের নিয়ে বিদ্রোহের চেষ্টা করেন। অন্যদের কাছে সাড়া না পাওয়ায় তিনি চ্যাথাম দ্বীপ থেকে সাগরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে পলায়নের চেষ্টা করেন। উপকূল থেকে গুলিবর্ষণের দরুন গতিপথ পরিবর্তনে বাধ্য হন, এবং শেষপর্যন্ত ধরা পড়েন। ওয়াকারের বিচারে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এবং দণ্ড অবিলম্বে

কার্যকরী হয়। নিরঞ্জন সিং নামে অপর একজন দুই-একদিনের মধ্যেই দ্বীপের একটি নির্জন স্থান বেছে নিয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন। ষষ্ঠ দিনে দুধনাথ তেওয়ারীর নেতৃত্বে একটি দল পালিয়ে গভীর অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে আদিম অধিবাসীদের বিষাক্ত তীরের ঘায়ে অনেকে প্রাণ হারান। যারা বেঁচে যান, তাঁদের মৃত্যু হয় খাদ্যের অভাবে এবং ব্যাধিতে। দুধনাথ তেওয়ারীকে আদিম জাতির মানুষেরা বন্দী করে নিয়ে যায়। সেখানে তিনি বছরখানেক ছিলেন। শোনা যায়, তিনি ওদের একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। তেওয়ারী পোর্টব্লেয়ারে ফিরে আসেন, বন্যমানুষেরা অ্যাবার্ডীন আক্রমণ করবে, এই সংবাদ নিয়ে। পূর্বাহ্নে সতর্ক করে দেওয়ার পুরস্কারস্বরূপ কতৃপক্ষ তাঁকে মার্জনা করে।

১৮৫৮ সালের এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে ২২৮ জনের একটি দল পালিয়ে বনের মধ্যে আশ্রয়ের সন্ধান করেন। তাঁদের মধ্যে ফিরে আসেন ৮৮ জন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকারের বিচারে তাঁদের প্রাণদণ্ড হয় একই দিনে। যাঁরা ফেরেন নি, তাঁরা হয় বন্য মানুষের আক্রমণে, অথবা খাদ্যের অভাবে, কিংবা মারাত্মক ব্যাধিতে প্রাণ হারান। ওয়াকার মাঝে মাঝে ভারত সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠাতো। একটি রিপোর্টে বনে পলাতক, এবং পরে প্রত্যাগত একজন বন্দীর কথা বলা হয়েছে। সে ব্যক্তি অনাহারে, ম্যালেরিয়া, এবং অন্যান্য ব্যাধিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শুধু তাই নয়, তার সর্বাঙ্গে বন্য উকুন ছেয়ে গিয়েছিল। এমনকি, তার পক্ষে চোখের পাতা খোলা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ব্যক্তির শোচনীয় অবস্থা দেখার পরে অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে বনে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্পে ভাঁটা পড়ে।

পালিয়ে না গেলেও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুর বিভীষিকার মোকাবিলা করতে হত। তাঁদের দেওয়া হত অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রমের কাজ। যথা— আদিম বনভূমি পরিষ্কার করা, পাহাড় কেটে পাথর ভেঙে রাস্তা তৈরী, ইঁট বানানো, ইত্যাদি। আদিম বন কেটে বৃহৎ বনস্পতিগুলিকে, বা গাছের নীচে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে বেড়ে ওঠা ঝোপঝাড় কেটে সাফ করা অত্যন্ত কঠিন। সেগুলি বয়ে নিয়ে আসা ততোধিক দুঃসাধ্য। বনে গাছ কাটতে যাওয়ার কাজে নিযুক্তদের প্রায়ই আদিম অধিবাসীদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ হারাতে হতো। ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দেশ ছিল, 'বন্য মানুষদের প্ররোচিত না করা'। কিন্তু ওয়াকারের হটকারী নীতি তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সরকারী হঠকারিতা এবং বন্যদের ক্ষ্যাপামির বলি হতে হয় হতভাগ্য দেশপ্রেমিকদের। উপরন্তু, নানা বিষাক্ত কীট-পতঙ্গ ও সরীসৃপের দংশনে হয় মৃত্যু, নতুবা সর্বাঙ্গে সাংঘাতিক ক্ষত, ম্যালেরিয়ার

প্রকোপে প্রাণত্যাগ, প্রভৃতি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেশপ্রেমিকদের দৈনন্দিন বরাদ্দ ছিল, কঠোর পরিশ্রমের উপরে লাঞ্ছনা, অপমান, নির্যাতন। তাঁদের কাজ করতে হত, সাধারণ কয়েদীদের মধ্য থেকে প্রমোশন পাওয়া 'পেটি-অফিসার'-এর অধীনে। এইসব কয়েদী অত্যন্ত জঘন্য অপরাধে দণ্ডিত। দয়া, মায়া প্রভৃতি মানবিক গুণ তাঁদের হয়ত একদিন ছিল, কিন্তু আলোচ্য সময়ে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার আশায় এরা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করত। কুৎসিৎ গালাগালি দিত। বাংলার জেলে কয়েদী-দের মধ্য থেকে যারা 'মেট' পদে উন্নীত হয়, তাদের নারকীয় সংস্করণ বলা যায় এই 'পেটি-অফিসার' নামক জীবদের।

ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য চিকিৎসার, এমনকি, প্রাথমিক ওষুধপত্রের ব্যবস্থাও ছিল না। ওয়াকারের হুকুমে বন্দীদের সামান্যতম অপরাধে বেত মারা হত। কর্মরত অবস্থায়ও ডাণ্ডাবেড়ী পায়ে চলাফেরা করতে হত। ফাঁসির হুকুম দেওয়াও রোজকার না হলেও, প্রায়ই ঘটে এমন ঘটনা। যে সব নির্বাসিত দেশপ্রেমিক কায়িক শ্রমে অভ্যস্ত ছিলেন না, তাঁদেরও কঠোর শ্রমসাধ্য কাজ দেওয়া হত। প্রাক্তন সিপাহী হিসাবে যাঁরা কঠোর জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এ হেন জীবন। ফলে আত্মহত্যার ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

অবশেষে ভারতের সংবাদপত্রে কয়েদী উপনিবেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে প্রশ্ন ওঠে। ফলে ডেভিস নামে একজন উচ্চ-পদস্থ রাজপুরুষকে সরেজমিনে অবস্থা পরিদর্শনের জন্য পাঠানো হয়। ডেভিস ওয়াকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করে। বিশেষতঃ বিদ্রোহী বন্দীদের সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে একত্রে রাখার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে। ডেভিস আন্দামান পরিদর্শন করে ১৮৬৭ সালে। ততদিনে কতজন বন্দী দেশ-প্রেমিকের প্রাণবলি হয়ে গিয়েছে, তার কোনও হিসেব নেই। এরপর পরিদর্শনে আসেন 'প্রেসিডেন্ট-ইন্-কাউন্সিল'। তিনি এইসব বন্দীদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে বিরূপ মন্তব্য করেন। বন্দীদের দৈনিক মজুরী দেওয়া হত এক আনা নয় পাই। তা থেকে দৈনন্দিন খাদ্য ছাড়াও পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করতে হত। 'প্রেসিডেন্ট-ইন্-কাউন্সিল' দেখেন যে, অধিকাংশ বন্দীর পরনে যা রয়েছে, তাকে ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করে, যেসব বিদ্রোহী বন্দী সুবোধ বালকের মতো নিয়মকানুন মেনে চলবেন, তাঁদের স্বদেশ থেকে নিজ নিজ পরিবারের

লোকজন, স্ত্রী-পুত্র কন্যাকে আনিয়ে এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে কিছুটা স্বাধীন-ভাবে বসবাস ও পছন্দমতো পেশায় নিযুক্ত হওয়ার সুবিধা দেওয়া যাবে।

ভারত সরকারের নির্দেশ সত্ত্বেও তা কাগজপত্রেই সীমিত হয়ে থাকে। একে তো তখন আমাদের দেশের মানুষের মনে 'কালাপানি', অর্থাৎ সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে সংস্কারের প্রবল বাধা। তদুপরি পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে সেই অজানা আতঙ্কের দ্বীপে যেতে কেউ রাজী হয়নি। ফলে যাঁরা নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করেও টিঁকে ছিলেন, তাঁদের পক্ষে ওখানকারই নারী কয়েদীদের বিবাহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। খানিকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অবসর যখন এসেছে, তখন তাঁরা সভ্যসমাজের বাইরেই রয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে কাউকে দেশে ফিরতে হয়নি। দেশবাসীর অগোচরে, অনাদরে, অবজ্ঞায় তিল তিল করে তাঁরা আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। আমাদের দেশের মুক্তিসংগ্রামের পথিকৃৎ অজ্ঞাত, অখ্যাত নামহীন মুক্তি যোদ্ধাদের স্মরণে পোর্টব্লেয়ারের জিমখানা ক্লাব ময়দানে একটি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বাধীনোত্তর কালে।

ওয়াহাবী আন্দোলনের যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদেরও আন্দামানে পাঠানো হয়। তাঁরাও অনুরূপ যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের সঠিক সংখ্যা বা নামধাম, বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। দুজনের নাম পাওয়া যায়। একজন শের আলী। ১৮৭২ সালে ইনি বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি লর্ড মেয়োকে হত্যার পর ফাঁসীকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করেন।

সেলুলার জেলের প্রথম পর্ব

সেলুলার জেল নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয় ১৮৯৪ সালে। কাজ শুরু হয় ১৮৯৬ সালে, এবং ১৮৯৮ সালের মধ্যে ৪০০টি সেল তৈরী হয়। অবশিষ্টগুলি শেষ হতে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত সময় লাগে। সেলের মোট সংখ্যা ৬৬৬, কারো কারো মতে, ৭০০।

সেলুলার জেলে বিপ্লবী বন্দীদের অবস্থানের প্রথম পর্ব ধরা হয়, ১৯১০ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত। ঐ সময়ে এমন কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে ওখানে পাঠানো হয়, যাঁরা বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক না হলেও, তাঁদের সঙ্গে একত্রে মিলে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। এঁরা ছিলেন রাজদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত কয়েকজন সম্পাদক। "স্বরাজ্য" এবং "যুগান্তর" পত্রিকার সম্পাদক। "স্বরাজ্য" ছিল এলাহাবাদ

থেকে প্রকাশিত একটি উর্দু সাপ্তাহিক। বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষী ভাষায় সমালোচনা করায় পর পর কয়েকজনকে শাস্তি দেওয়া হয়। এঁরা হলেন রামহরি, নন্দগোপাল, লাধা রাম, এবং হোতিলাল ভার্মা এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত রামচরণ লাল।

ভারত সরকারের ১৯০৬ সালে গৃহীত একটি সিদ্ধান্ত ছিল যাবজ্জীবন দণ্ডের (Lifer, জেলের পরিভাষায় দায়মুলি) কম মেয়াদী কোন বন্দীকে সেলুলার জেলে না পাঠানো। কিন্তু অচিরেই সে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হল। ঐ সময় বাংলা, উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। কয়েকটি ষড়যন্ত্র মামলায় বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তির কঠোর কারাদণ্ড হয়। যাঁরা যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন, তাঁরাও গভর্নমেন্টের চোখে অত্যন্ত সাংঘাতিক মানুষ। তাঁদের দেশের জেলে রাখা নিরাপদ নয়। সুতরাং ৭-৮ বৎসর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদেরও সেলুলার জেলে পাঠানো শুরু হয়। প্রথম যে দলটিকে পাঠানো হয়, তাঁরা ছিলেন আলিপুর বোমার মামলার আসামী। পরে বাংলার বিভিন্ন জেল থেকে অন্যান্য বিপ্লবী বন্দীদেরও পাঠানো হয়।

১৯১০ থেকে ১৯২১ এর মধ্যে যাঁরা সেলুলার জেলে বন্দী ছিলেন, তাঁদের কয়েকজনের নাম নীচে উল্লেখ করা গেল :—(১) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, (২) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (৩) হেমচন্দ্র দাস, (৪) হেমচন্দ্র কানুনগো, (৫) ইন্দুভূষণ রায়, (৬) নিরাপদ রায়, (৭) ননীগোপাল, (৮) উল্লাসকর দত্ত, (৯) পুলিন দাস, (১০) মদনমোহন ভৌমিক, (১১) ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, (১২) শচীন সান্যাল, (১৩) আশুতোষ লাহিড়ী, (১৪) নিখিল গুহরায়, (১৫) নরেন ঘোষ চৌধুরী (১৬) বিনায়ক দামোদর সাভারকর, (১৭) গণেশ দামোদর সাভারকর, (১৮) বামন যোশী, (১৯) সর্দার পৃথ্বী সিং আজাদ, (২০) সর্দার গুরুমুখ সিং, (২১) সর্দার ভান সিং, (২২) পণ্ডিত রামরক্ষা, (২৩) পণ্ডিত পরমানন্দ প্রভৃতি।

[মৈত্রীচক্র কর্তৃক প্রকাশিত "মুক্তিতীর্থ আন্দামান" নামক স্মারকগ্রন্থে পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয়েছে।]

"প্রাক্তন আন্দামান নির্বাসিত বন্দী মৈত্রীচক্র" কর্তৃক প্রকাশিত "মুক্তিতীর্থ আন্দামান" নামক দুটি বাংলা, এবং ঐ নামেই একটি ইংরেজী স্মারকগ্রন্থে বিস্তৃত তালিকা দেওয়া হয়েছে। সবে মিলে বিপ্লবী বন্দীদের মোট সংখ্যা ছিল ১৩৩ জন। তার মধ্যে ৮১ জন পাঞ্জাব থেকে, ৩৮ জন বাংলা থেকে, ১১ জন উত্তরপ্রদেশ থেকে, এবং ৩ জন মহারাষ্ট্র থেকে গিয়েছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনজনকে শহীদ হতে হলো। পণ্ডিত রামরক্ষা ছিলেন

হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। উপবীত কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে অনশনে তিনমাস কাটাবার পর প্রাণত্যাগ করেন। ইন্দুভূষণ রায় কারাযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন। সর্দার ভান সিংকে কারারক্ষী, এবং কয়েদী রক্ষীরা নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করে। উল্লাসকর দত্ত জীবিত থাকলেও মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ-ভাবে হারিয়ে ফেলেন।

সেলুলার জেলের বিপ্লবী বন্দীদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি সূত্র থেকে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। যথা—(১) জাতীয় মহাফেজখানায় রক্ষিত বন্দীসংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র। (২) সমকালীন জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে বন্দীদের অবস্থা সম্বন্ধে প্রকাশিত তথ্য, (৩) প্রাক্তন বন্দীদের লিখিত কয়েকটি অসামান্য স্মৃতি-গ্রন্থ। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের বইটির প্রথমে মারাঠীভাষায়, এবং পরে ইংরাজী সংস্করণ হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বইটিও প্রথমে ইংরাজী, ও পরে বাংলায় প্রকাশিত হয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বইটির নাম সম্ভবতঃ "দ্বীপান্তর বন্দী।" বইটি অনেকদিন আগে পড়েছি, এখন সঠিক মনে নেই। এটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। মদনমোহন ভৌমিকের, "আন্দামানে দশবৎসর" বইটিও দুষ্প্রাপ্য। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নির্বাসিতের আত্মকথা" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কৌতুকের ভিয়েন দিয়েও জেলের যে চিত্রটি তুলে ধরেন, তা ভয়াবহ। যমদূত সদৃশ "পেটি অফিসার"দের ছবিটি তাঁর লেখনীর মুখে সজীব হয়ে উঠেছে। শচীন সান্যালের "বন্দীজীবন" বইটির কয়েকটি অধ্যায় এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জেলে ত্রিশ বৎসর" বইটির কয়েকটি অধ্যায়ে সেলুলার জেলের জীবনের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর বিবরণে বিপ্লবীদের বেপরোয়া প্রতিরোধ, এবং অনমনীয় সংকল্পের কাহিনী প্রাণবন্ত। "নির্বাসিতের আত্মকথা" এবং "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জেলে ত্রিশ বৎসর" বইদুটির নতুন সংস্করণ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিপ্লবীদের স্মৃতিগ্রন্থগুলির, বিশেষতঃ বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এবং ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর বই-গুলি থেকে তথ্য সংকলন করেছেন। সরকারী নথিপত্রে প্রাপ্ত তথ্যগুলিও উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর "Penal Settlement in the Andamans" গ্রন্থটিতে একটি রূপরেখা তুলে ধরেছেন। তা থেকে আমরা ১৯১০ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত কালানু-ক্রমিকভাবে নিম্নলিখিত বিবরণ পাই :—

ভারত গভর্নমেন্ট বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বন্দীরূপে গণ্য করতে রাজী নয়। অথচ, তাদের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হত। সেইগুলি

সাধারণ কয়েদীদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। সাধারণ কয়েদীরা জেলের নিয়মে যেটুকু সুবিধা পেতে পারে, বিপ্লবীরা তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সরকারী নির্দেশ ছিল—

(ক) এদের সাংঘাতিক রকমের বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করতে হবে।

(খ) তাদের পরস্পরকে একসঙ্গে কাজ করতে দেওয়া হবে না। বিশেষতঃ বাঙালী বন্দীদের ক্ষেত্রে এটা কড়াকড়িভাবে প্রযোজ্য হবে।

(গ) তাদের জেল অফিসের কেরাণীর কাজে নিযুক্ত করা যাবে না, এবং

(ঘ) তাদের সবচেয়ে কঠিন কাজ দিতে হবে।

এখানে বলে রাখা ভালো, শিক্ষিত কয়েদীদের দিয়ে জেল অফিসের কেরাণীর কাজ করানো ছিল ইংরেজ আমলের প্রচলিত সাধারণ নিয়ম। বিপ্লবীদের বেলায় তার ব্যতিক্রমের আদেশ দেওয়া হয়। সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের কাজের জন্য ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়। জেলখানার পরিভাষায় একে বলা হয় 'গ্যাং' (Gang)।

গভর্নমেণ্টের উপরোক্ত নীতি কাজে প্রয়োগ করার জন্য যে ব্যক্তিটির উপর প্রধান দায়িত্ব ছিল, তার নাম ব্যারী (Barry)। এই ইংরেজ পুঙ্গবটি ছিল পূর্বে উল্লিখিত 'ওয়াকার'-এর নতুন সংস্করণ। তফাৎ এইটুকু, তার হাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কুৎসিত গালাগালি ছিল তার জিহ্বার ভূষণ। সেলুলার জেলের গেটে পেঁছাবার পর বিপ্লবীদের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটত এই ব্যক্তিটিরই সঙ্গে। সে সদম্ভে জানিয়ে দিত, "এই যে জেল দেখছ, এখানে সিংহকে পোষ মানানো হয়। ভিতরে গেলে তোমাদের বন্ধুদের দেখা পাবে। কিন্তু মনে রেখো, কারো সঙ্গে কথা বলবে না।"

পেটি-অফিসারদের প্রতি তার হুকুম ছিল—"এরা হচ্ছে ঘৃণ্য জীব (বিপ্লবী বন্দীরা)। এদের সবচেয়ে কঠিন কাজ দেবে। দিনের শেষে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'খাটুনী' বুঝিয়ে দিতে না পারলে আমার সামনে হাজির করবে। আমি চাবুকে তাদের পশ্চাদ্দেশের চামড়া তুলে নেবো।"

কয়েদীদের প্রত্যেকদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে হয়। তাকে বলে 'খাটুনী।' বিপ্লবীদের দেওয়া হতো ঘানি টানা, নারকেলের ছোবড়া পিটিয়ে নরম করা, এবং নারকেলের রশি পাকানো, ইত্যাদি কাজ। সব চাইতে কষ্টসাধ্য ছিল ঘানি টানা। বন্দীরা অস্বীকার করলে হাতকড়া দিয়ে ঘানির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হত, তারপর চারপাশে ঘুরতে বাধ্য করা হত, ঘানি টানার বিরুদ্ধেই বিপ্লবী বন্দীদের মিলিত প্রতিরোধ প্রথম সংগঠিত হয়। নন্দগোপালকে ঘানি টানতে দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন বলিষ্ঠদেহী ক্ষত্রিয়। তিনি বলেন, "আমি ঘানির সঙ্গে

ঘুরবো না। ঘানি আমার সঙ্গে ঘুরবে।"—অর্থাৎ খুবই মন্থরগতিতে চলবে। নন্দগোপালের প্রতিবাদের জবাবে জেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হুকুম জারী করে, বিপ্লবীদের প্রত্যেককে কয়েকদিন বাধ্যতামূলকভাবে ঘানি টানতে হবে। বিপ্লবীরা উপলব্ধি করেন, এ আদেশ মেনে নেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, উচিত হবে না। নন্দগোপাল শুরু করেন অনশন, অন্যান্য বন্দীরা কর্মবিরতি। জেল কর্তৃপক্ষের হাতে শাস্তি দেওয়ার যতগুলি অস্ত্র ছিল, সবই একে একে কাজে লাগানো হয়। পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী, খাড়া হাতকড়া (সেলের দেওয়ালের সঙ্গে পোঁতা একটি লোহার আংটার সঙ্গে হাতকড়া বন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা) পেনাল ডায়েট, বা ভাতরুটীর বদলে শুধু মাড়। এতেও যখন বন্দীদের মনোবল ভাঙা গেল না, তখন একাকী সেলে বন্ধ করা। সাধারণ কয়েদীদের এই শাস্তি দেওয়া হলে স্নান, খাওয়া ইত্যাদির জন্য কিছুক্ষণের জন্য বাইরে আসার সুযোগ দেওয়া হত। বিপ্লবীদের তা দেওয়া হল না। ফলে ২৪ ঘন্টাই তাঁরা একা বন্দী অবস্থায় থাকতে বাধ্য হন। ক্রমে তাঁদের স্বাস্থ্যের উপরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। একে তো আন্দামানের জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থকর হওয়াতে অনেকের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল, তার উপর উপরোক্ত শাস্তিগুলির পরিণতি খারাপ হতে বাধ্য। জেল কর্তৃপক্ষ উপলব্ধি করে, এভাবে চলতে থাকলে অনেকগুলি প্রাণহানির জন্য তারা দায়ী হবে। তখন প্রতিরোধ ভাঙবার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মদনমোহন ভৌমিক প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কয়েকজনকে জেলের বাইরে জঙ্গল কাটা, রাস্তা তৈরী, ইত্যাদি কাজের জন্য পাঠানো হয়। যাঁরা জেলে রয়ে গেলেন, তাঁরাও কিছুদিন পর অনশন ভঙ্গ করেন।

যাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন, তাঁদের অবস্থাটা দাঁড়াল তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত উনুনে পতনের অনুরূপ। একে তো জঙ্গলকাটা, রাস্তা বানানো, ইঁট বানানো খুব কষ্টসাধ্য, তার উপর আছে প্রায় বিষুব অঞ্চলের প্রখর রৌদ্রের তাপ, এবং বছরের বেশীর ভাগ সময়ে প্রবল বর্ষণ, বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশন। অধিকন্তু হিসাবে দেখা দিল আর এক নতুন বিপত্তি। জেলে থাকার সময়ে বরাদ্দ খাদ্যটা পুরোপুরি পাওয়া যেত। এখানে দেখা গেল বরাদ্দের বেশ কিছু অংশ পেটি-অফিসারেরা আত্মসাৎ করে, এবং তা গ্রামবাসীদের কাছে বিক্রী হয়ে যায়। এরূপ অবস্থায় বেশীদিন কাটানো যাবে না বুঝে বিপ্লবীরা আবার কর্মবিরতির পথ বেছে নিলেন। কয়েদীর পক্ষে 'খাটুনী' অস্বীকার করা, এবং অনশন গুরুতর অপরাধ। সেজন্যে জেলের শাস্তি ছাড়াও আদালতের বিচারে অতিরিক্ত কারাদণ্ড হতে পারে। মূল দণ্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ঐ অতিরিক্ত দণ্ড প্রযোজ্য হয়। এ যেন

বোঝার উপরে শাকের আঁটি। এঁদের তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে জেলে ফেরৎ পাঠানো হল। সেখানে সেই আগের ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি। বন্দীরা নিজেদের অবস্থা প্রতিকারের দাবী জানিয়ে ভারত সরকারের কাছে দরখাস্ত এবং স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। সেগুলি যথারীতি ফাইলবন্দী হয়েছিল। ভারত সরকারের টনক নড়ে তৃতীয় দফায় প্রতিরোধ সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে। জেলের ভিতরের খবর জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। "ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল"-এ প্রশ্ন ওঠে। অগত্যা ভারত সরকারকে কিছু করতেই হয়। অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব স্যার রেজিন্যাল্ড ক্র্যাডক্‌কে (Sir Reginal Craddock) সেলুলার জেলে পাঠানো হল (১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে)। তিনি বন্দীদের সঙ্গে দেখা করেন নি। কিন্তু ফিরতি পথে "মহারাজা" জাহাজে বসেই কতকগুলি মন্তব্য, এবং সুপারিশ করেন। "এস. এস. মহারাজা" জাহাজটি সেই যুগ থেকেই কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ারে বন্দীদের নিয়ে যেত। জেল কর্তৃপক্ষ ক্র্যাডক্‌এর সুপারিশগুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা আর একবার অনশন শুরু করায় কর্তৃপক্ষ উক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করতে বাধ্য হয়। সেগুলি ছিল নিম্নরূপ :—

(১) যাবজ্জীবনের কম দণ্ডে দণ্ডিত সমস্ত বন্দীদের দেশে ফিরে পাঠানো, এবং নিজ নিজ প্রদেশের জেলে রাখা হবে।

(২) যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিতদের ১৪ বৎসর পর্যন্ত জেলে আটক রাখা হবে। তারপর বাইরে পাঠিয়ে হাল্কা ধরনের কাজ দেওয়া হবে।

(৩) জেলে থাকাকালীন তাদের ভালো খাদ্য, এবং ভালো পরিধেয় দেওয়া হবে।

(৪) জেলে নিয়মশৃংখলা মেনে চলার পুরস্কারস্বরূপ সশ্রম কারাদণ্ডের বদলে বিনাশ্রম কারাদণ্ডের সুযোগ দেওয়া হবে।

(৫) ঘানি টানার মতো কঠিন ও অপমানজনক কাজের বদলে হাল্কা ধরনের কাজ দেওয়া হবে।

(৬) পড়ার জন্যে বই দেওয়া হবে।

(৭) মাঝে মাঝে কাজ থেকে ছুটির সুযোগ দেওয়া হবে।

(৮) সাধারণ কয়েদীদের যে সব সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, রাজনৈতিক বন্দীরাও তা পাবেন।

জেনে রাখা ভালো, জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মীমাংসা হওয়ার আগে পর্যন্ত বিপ্লবী বন্দীদের নানারকম শাস্তিভোগ করতে হয়েছে, এবং অতিরিক্ত ছমাস করে কারাদণ্ড হয়েছে। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী বন্দীদের প্রথম দলকে কলকাতায়

ফিরিয়ে আনা হয় ১৯১৪ সালের মে মাসে। যাঁদের দেশে ফেরৎ পাঠাবার কথা, তাঁদের সকলকেই ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ভারত সরকারকে নীতি পরিবর্তন করতে হল। ততদিনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারতে গুপ্ত বিপ্লবী আন্দোলনের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করেন। বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের সঙ্গে তাঁরা সংযোগ স্থাপন করেন। সৈন্যরাও সেই ডাকে সাড়া দেয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, একজন বিশ্বাসঘাতক কর্তৃপক্ষের কাছে সেই সংবাদ পৌঁছে জানিয়ে দেয়। জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে ষড়যন্ত্রমূলক অভ্যুত্থান পরিকল্পনার এটাই প্রধান দুর্বলতা। সামান্য ভুলে, অথবা মাত্র একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় গোটা পরিকল্পনার অকালমৃত্যু ঘটে। অথচ, সেই সময় ভারতে ইংরাজ সৈন্যের সংখ্যা ছিল খুবই কম। বিপ্লবীদের পরিকল্পনা সফল হলে ভারত বৃটিশের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই প্রবল। বিপ্লবীদের আরেক অংশ জার্মানী থেকে প্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে পূর্বাঞ্চলে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে যায়। ভারত সরকার বিপ্লব প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত সন্দেহে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি বড় বড় ষড়যন্ত্রের মামলা চলে। কিছু লোকের ফাঁসী হয়। অন্যদের যাবজ্জীবন থেকে শুরু করে ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হয়। (একমাত্র লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়ই ২৮ জনের ফাঁসী হয়।) ভারত সরকার আবার বিপ্লবী বন্দীদের ঢালাওভাবে সেলুলার জেলে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৪ সাল থেকে ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত সেলুলার জেলে পাঞ্জাব থেকে প্রেরিত বন্দীদের সংখ্যাই ছিল বেশী।

বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিতরা ছাড়াও আরো কিছুসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়। যথা—(১) যেসব সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করে, এবং সামরিক আদালতে দণ্ডিত হয়।

(২) পাঞ্জাব ও গুজরাটে সামরিক আইন লঙ্ঘনের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা।

(৩) ব্রহ্মদেশে ভারতীয় সৈন্যদের অভ্যুত্থান ঘটাবার ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরা। পণ্ডিত রামরক্ষা ছিলেন শেষোক্তদেরই একজন।

বাইরে সারা দেশে তখন গভর্নমেন্টের দমননীতির তাণ্ডব চলেছে। বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ১৮১৮ সালের ৩নং রেগুলেশন (Regulation III of 1818) এ বিনাবিচারে আটক এবং ভারতের বাইরে পাঠানো হয়। সংবাদ-

পত্র, সভাসমিতি ইত্যাদির উপর কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রযুক্ত হয়। জেলের ভিতরেও তার প্রতিফলন হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের যেসব সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। দ্বিতীয় দফায় যেসব রাজনৈতিক বন্দীকে সেলুলার জেলে পাঠানো হয়, তাঁরা সেখানে আসেন ১৯১৬ সালে। অনুশীলন সমিতির কিম্বদন্তীর নায়ক ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী ('মহারাজ' নামে পরিচিত) ১৯১৬ সালেই সেলুলার জেলে আসেন। এই সময়কার প্রতিরোধ আন্দোলনের বিশদ বিবরণ তাঁর লেখা পূর্বে উল্লিখিত বইটিতে পাওয়া যায়।

জেল কর্তৃপক্ষ বিপ্লবী বন্দীদের ঠিক আগের মতোই ছোবড়া পিটানো, ঘানি টানা ইত্যাদি কঠিন কাজ দেওয়ার নীতি গ্রহণ করে। বন্দীদের তরফ থেকে প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়। এবার তাঁরা স্থির করেন যে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলারের কুৎসিৎ গালাগালি নীরবে সহ্য করা হবে না। সর্দার ভান সিং ঘানি টানতে অস্বীকার করায় তাকে হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় ঘানির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ঘুরতে বাধ্য করা হয়। পরের দিন তিনি যখন জেলে বন্ধ, তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিদর্শনে এসে তাঁকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করে, "কিরকম আছো?" ভান সিং জবাব দিলেন, "তুমি কি আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করেছো এবং সেইজন্য এত খোঁজখবর নিচ্ছ?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব ক্রুদ্ধ হয়ে শাস্তিনির্দেশ করে। জেল আইনের শাস্তি, অর্থাৎ ভাণ্ডাবেড়ী দিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। পরে এক সময় কয়েকজন সান্ত্রী, এবং কয়েদী রক্ষী ভান সিংএর সেলের দরজা খুলে তাঁকে মেঝের উপর ফেলে নির্মমভাবে প্রহার করে। তিন-চার দিন পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পণ্ডিত রামরক্ষাও দু-একদিনের মধ্যেই তিনমাসের অনশনের পর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দুটি মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। একসঙ্গে ৭০ জন কর্মবিরতি ঘোষণা করেন। ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী স্থির করেন, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিদর্শনে এলে তাকে হিন্দীতে গালাগালি দিতে হবে। তাহলে সাধারণ কয়েদীরাও বুঝতে পারবে, এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খুব অপমানিত হবে। হলোও তাই। ভান সিংএর মৃত্যুতে জেল কর্তৃপক্ষ খুব বেকায়দায় ছিল। তাই ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর ক্ষেত্রে অনুরূপ দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা হল না। তাঁকে দেওয়া হলো ছ'মাসের জন্যে ভাণ্ডাবেড়ী এবং একমাসের জন্য 'পেনাল ডায়েট', অর্থাৎ মাড়। কার্যতঃ ফল হলো বিপরীত। ঘটনাটার বিবরণ সাধারণ কয়েদীদের মুখে মুখে সারা জেলময় রটে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "বাঙালী শের (বাঘ) হ্যায়।" দেখা গেল, কিচেন থেকে যারা খাদ্য নিয়ে আসে, তারা মাড়এর বদলে নিয়ে এসেছে ভাত ও রুটি। তাও অন্যদিনের থেকে

বেশী পরিমাণে। কর্মবিরতির পর শুরু হল অনশন। একসঙ্গে ১০০ জন অনশন শুরু করেন। বিপ্লবী বন্দীরা জানতেন না, যে তাঁদের দুঃখের দিনের অবসান আসন্ন। কিভাবে জানি না, সমস্ত খবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোচরে আসে, তিনি 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় কড়া মন্তব্য করেন। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলেও প্রশ্ন তোলেন। ভারত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলারের বদলীর হুকুম আসে। নতুন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং জেলার রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হয়। মীমাংসার শর্তগুলি প্রায় সবই একটি মাত্র দাবী ছাড়া বন্দীদের অন্যান্য দাবী পূরণ করে। রাজনৈতিক বন্দীরা দাবী করেছিলেন, ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক বন্দীদের সমান অধিকার দিতে হবে। এটি মানতে ভারতসরকার রাজী হবে না, জানা কথা। তবে এবার বন্দীরা পূর্বে উল্লিখিত সুবিধাগুলির সঙ্গে কয়েকটি অতিরিক্ত অধিকার লাভ করেন। যথা—(১) আত্মীয়-স্বজনের কাছে দীর্ঘ চিঠি লেখার অনুমতি, (২) স্নানের জন্য নোনা জলের বদলে পরিশ্রুত জল, (৩) শিখদের জন্য তৈল ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর গ্রন্থে জানা যায়, এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে আত্মহত্যার বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে। অবশ্য এর মধ্যে কতজন রাজনৈতিক বন্দী, তা সঠিক জানা যায় না।

১৯১৭ সালে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতবর্ষকে "ধীরে ধীরে আত্মশাসন" (Progressive Self-Government) দানের নীতি ঘোষণা করে। ১৯১৮ সালের মধ্যে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নতুন শাসনসংস্কার অনুমোদন করে বৃটিশ পার্লামেণ্টে একটি আইন গৃহীত হয়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের অন্ততঃ একটা অংশও যাতে নতুন শাসনসংস্কার গ্রহণ করে, সেজন্য ভারত গভর্নমেণ্ট সচেষ্ট হয়। চণ্ডনীতির বজ্রমুষ্টিও সাময়িকভাবে শিথিল হয়। ১৯১৯ সালে কারাসংস্কার কমিটি পোর্টব্লেয়ার এবং সেলুলার জেল পরিদর্শন করে। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ভারত গভর্নমেণ্ট ভবিষ্যতে সেলুলার জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের না পাঠাবার নীতি অনুমোদন করে। যেসব বন্দী ওখানে ছিলেন, তাঁদের সকলকেই ১৯২১ সালের মধ্যে দেশের বিভিন্ন জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়। তার কিছুদিন পর ভারত সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত (General Amnesty) ঘোষণা করে।

সেলুলার জেলের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে এইভাবে। দ্বিতীয় পর্বের যবনিকা উত্তোলিত হয় ১৯৩২ সালে। ১৯২৯ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৩০-৩২ পর্যন্ত সারা উত্তর ভারত জুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন গভর্নমেণ্টের রাতের ঘুম,

কেড়ে নেয়। তখন ভারতের, বিশেষতঃ বাংলার কারাগার থেকে বিপ্লবী বন্দীদের পলায়নের কতকগুলি ঘটনা ঘটে। এদিকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে ওঠায় জেলগুলিতে স্থান সংকুলান হয় না। বিনাবিচারে আটক বিপ্লবীদের জন্য আলাদা আলাদা বন্দীশিবির স্থাপিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারাগারে দণ্ডিত বিপ্লবীদের সঙ্গে সত্যাগ্রহী বন্দীদের মেলামেশা ঠেকাবার জন্যে গভর্নমেণ্ট খুব তৎপর হয়। এইসব কারণে ১৯২০-২১ সালের ঘোষিত নীতির পরিবর্তন করে বিপ্লবী বন্দীদের সেলুলার জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। এই পর্বে বিপ্লবী বন্দীদের সংখ্যা ছিল ৩৬৬ জন। তার মধ্যে বাংলা থেকে ছিল ৩৩১ জন, বিহার থেকে ১৮ জন, উত্তরপ্রদেশ থেকে ১০ জন। পাঞ্জাব ও মাদ্রাজ থেকে ৩ জন করে এবং দিল্লী থেকে ছিল ১ জন। প্রথম দলটি ওখানে যান ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ইতিপূর্বে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীরা রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে সুবিধা পাওয়ার দাবীতে বারবার অনশন করেছিলেন। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের জোয়ার যখন উঠতির মুখে, তখন গভর্নমেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদের আচরণ সম্বন্ধে কিছু সুযোগসুবিধা দানের নীতি মেনে নেয়। কিন্তু সেটা ছিল খুবই সীমিত এবং 'রাজনৈতিক বন্দী' শব্দটির প্রতি গভর্নমেণ্টের ছিল নিদারুণ অনীহা। সামাজিক মর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, এবং জীবনযাত্রার মান, ইত্যাদি বিচারে কিছু সংখ্যককে দ্বিতীয় শ্রেণী-ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। বলা বাহুল্য, দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশ সেইসব সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকেন। সেলুলার জেলে যে অল্প-সংখ্যক বন্দী দ্বিতীয় শ্রেণীর সুবিধালাভ করেন, তাঁদের অবস্থা অন্যদের তুলনায় মোটামুটি সহনীয় ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের ক্ষেত্রে ১৯১২ থেকে ১৯১৪ এবং ১৯১৬ থেকে ১৯১৭ সালের আচরণেরই পুনরাবৃত্তি হয়। একটু তফাৎ আছে। এবার কাউকে ঘানি টানতে বাধ্য করা হয়নি। এ অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনশন সংগ্রাম। সে সম্বন্ধেতো বারবার বিভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁদের কল্পনাশক্তি প্রখর, তাঁদের পক্ষে প্রথম পর্বের থেকে দ্বিতীয় পর্বের গোড়ার দিকে উত্তরণ সহজ হবে।

যাঁদের চরণচিহ্ন অনুসরণ করে আমরা সেলুলার জেলে পৌঁছেছিলাম, তাঁদের দেশপ্রেমে কোনও খাদ ছিল না। দেশের মানুষকে তাঁরা গভীরভাবে ভালোবেসে-ছিলেন। সেইজন্যই কারাগারের অন্তরালে তিলে তিলে আত্মবিসর্জন, এবং দুঃখ-বরণের অগ্নিপরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন, আমরাও সেই মহান পূর্বসুরীদের ঐতিহ্য অক্ষুন্ন রেখে ফিরে এসেছি। তাইতো যে সেলুলার জেল ছিল একদিন

দেশপ্রেমিকদের উপর নির্যাতনের স্থান হিসাবে কুখ্যাত, "শিকল পূজার পাষাণ-বেদী" তা আজ পরিনত হয়েছে তীর্থভূমিতে। রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় আমাদেরও অবদান আছে। সেই অধিকারে স্মৃতিচারণে প্রবৃত্ত হয়েছি। ১৯৭৯ সালের তীর্থযাত্রার প্রসঙ্গ দিয়েই লেখা শুরু করা যাক।*

---

* দ্বিতীয় পর্ব সম্বন্ধে সরকারী নথিপত্রে, জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের প্রকাশিত খবরাখবর, এবং প্রাক্তন বন্দীদের রচিত স্মৃতিগ্রন্থ থেকে বিশদ বিবরণ পাওয়া যাবে। প্রথম বইটি প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ ১৯৩৯ সালের গোড়ার দিকে, লেখক বিজয়কুমার সিংহ। নাম—"Andamans—the Indian Bastille"। সেই সময়ে নতুন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আইন অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভাসমিতি, পত্রপত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির অধিকার খানিকটা সম্প্রসারিত হয়েছে। যেসব প্রদেশে জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেন, সেখানে তুলনামূলকভাবে ঐসব সুযোগ আরো বেশী। বিজয়কুমার সিংহের বইটি প্রকাশিত হয় সম্ভবতঃ উত্তরপ্রদেশে। তবু তিনি অনেকটা সতর্কতার সঙ্গে বইটি লিখেছেন। তাঁর বইতে জেলের বিভিন্ন ঘটনা সম্বন্ধে সন, তারিখ সহ তথ্য পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো যে জিনিসটি পাওয়া যায়, তা হলো বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হয় অনন্তকুমার ভট্টাচার্যের লেখা "আন্দামান বন্দী" নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত বর্তমান লেখকের "বন্দীজীবন" বইটির দু-একটি অধ্যায়ে সেলুলার জেলের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রতিক একদশকের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে নলিনী দাশের, "স্বাধীনতা সংগ্রামে দ্বীপান্তর বন্দী", এবং গণেশ ঘোষের "মুক্তিতীর্থ আন্দামান"। বর্তমান লেখকের, "আমার বিপ্লব জিজ্ঞাসা" গ্রন্থের দুটি অধ্যায়ে সেলুলার জেলের জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। "প্রাক্তন আন্দামান নির্বাসিত বন্দীমৈত্রী চক্র" কর্তৃক সর্বশেষ প্রকাশিত ইংরাজী স্মারকগ্রন্থ "Muktitirtha Andaman" বইটিতে বিশদ বিবরণ ছাড়াও দুই পর্বের বন্দীদের যতটা সম্ভব পূর্ণতালিকা দেওয়া হয়েছে। কারা জীবিত এবং কারা প্রয়াত, তারও তালিকা আছে। উপরন্তু আছে দুই যুগের বিপ্লবী বন্দীদের ফটোসহ সংক্ষিপ্ত জীবনী।

৪

তীর্থযাত্রার পূর্বসূচনা

দ্বিতীয়বারের আন্দামান যাত্রার পিছনেও একটা ইতিহাস আছে। ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত একটানা প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। অক্লান্তভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে প্রাক্তন আন্দামান নির্বাসিত বন্দী মৈত্রী চক্র। সেই বিষয়ে কিছুটা না লিখলে এ কাহিনী অংগহীন হয়ে থাকবে। তবে একটা কথা বলে রাখা ভাল। মৈত্রীচক্রের কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। যাঁরা এবিষয়ে বিস্তৃত তথ্য জানতে আগ্রহী, তাঁরা উক্ত সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত "মুক্তি-তীর্থ আন্দামান" নামে তিনটি স্মারক গ্রন্থে বিশদ তথ্য পাবেন। আমার উদ্দেশ্য মৈত্রী চক্রের কাজের রাজনৈতিক তাৎপর্য তুলে ধরা।

মৈত্রীচক্র গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গেশ্বর রায়, বিনয় বসু, বিশ্বনাথ মাথুর, সমর ঘোষ, ফকির সেন প্রভৃতি। অনবধানতাবশতঃ যেসব বন্ধুদের নাম বাদ পড়ে যাবে, তাঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখছি। অনুষ্ঠানিকভাবে মৈত্রীচক্রের প্রতিষ্ঠা, এবং নামকরণ হয় ১৯৬৯ সালে। সভাপতি সর্দার পৃথ্বী সিং আজাদ, এবং সাধারণ সম্পাদক বঙ্গেশ্বর রায়। পরবর্তীকালে পৃথ্বী সিং আজাদ ছাড়া গণেশ ঘোষ, এবং প্রবীণ আন্দামান বন্দী ডাঃ ভূপাল বসুকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ছে, তাঁরা হলেন প্রবোধ রায়, সত্য চক্রবর্তী, সীতাংশু দত্তরায় (খুশু রায়), জ্যোতিষ মজুমদার, গোপাল আচার্য্য, সমর ঘোষ, বিশ্বনাথ মাথুর, খুশীরাম মেটা, বারীন চৌধুরী। এঁদের মধ্যে খুশীরাম মেটা, এবং বিনয় বসু প্রয়াত।

মৈত্রীচক্রের লক্ষ্য হিসাবে দুটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। (১) কেন্দ্রীয় সরকার যাতে প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের সম্মানভাতা বা পেনশন্ মঞ্জুর করেন সেইজন্যে চেষ্টা, এবং (২) সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসাবে স্বীকৃতিদানের চেষ্টা।

স্বাধীনতালাভের পর কেন্দ্রীয় সরকার, এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকার প্রাক্তন

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশন দানের একটা কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তবে সেই পেনশন ছিল নেহাৎই দাক্ষিণ্যের দান। পরিমাণ সামান্য, বহু শর্তকণ্টকিত। একটি প্রধান শর্ত ছিল, পেনশনের জন্যে আবেদনকারীকে কোনও রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য হলে চলবে না। আমলাতন্ত্রের দৌলতে অন্যান্য শর্তগুলিও ছিল অসম্মানজনক। অধিকন্তু, লাল ফিতার বজ্র-আঁটুনি, ফস্কা গেরো। বহু স্বাধীনতা সংগ্রামী নিজের মর্যাদা খুইয়ে পেনশনের জন্য আবেদন করতে রাজী হননি। অন্যদিকে, ফস্কা গেরোর কল্যাণে এমন কিছু লোক পেনশন পেয়েছে, যারা পাওয়ার উপযুক্ত নয়।

(১) মৈত্রীচক্র সম্মানভাতা বা পেনশনের দাবীকে সঠিক রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তুলে ধরে। দাক্ষিণ্যের দান নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিশেষতঃ আন্দামান বন্দীদের অবদানের স্বীকৃতি হিসাবে সম্মানজনকভাবে নিঃশর্ত উপযুক্ত পেনশনের ব্যবস্থা করা চাই। স্বাভাবিকভাবেই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত হয় আন্দামান বন্দীদের পেনশনের প্রশ্নে। এরাই স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেক বেশী দুঃখকষ্ট বরণ করেছেন, একটানা দীর্ঘদিন কারাগারের অন্তরালে জীবন কাটিয়েছেন। আন্দামান বন্দীরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে গেলেও তাঁরা ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারেরই প্রত্যক্ষ হেফাজতে। অতএব তাঁদের পেনশন কেন্দ্রীয় সরকারকেই দিতে হবে, এবং তা করতে হবে নীতি হিসাবে।

(২) সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসাবে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটির আরো তাৎপর্য রয়েছে। সরকারী উদ্যোগে স্বাধীনতা সংগ্রামের যেসব ইতিহাসগ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেখানে সশস্ত্র বিপ্লবী ধারাটির অবদান হয় একেবারেই উপেক্ষিত, নতুবা খানিকটা যেন দায়ে ঠেকে উল্লিখিত। সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসাবে স্বীকৃতির অর্থ হবে সারা ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবী ধারাটির যথাযোগ্য মর্যাদাদান। সেইসঙ্গে মৈত্রীচক্র বিনাবিচারে আটকের বন্দীশিবিরগুলি, যথা বক্সা এবং দেউলি ক্যাম্পকেও জাতীয় স্মারক রূপে স্বীকৃতিদানের কথা তোলেন।

ইতিমধ্যে মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তাদের কাছে খবর আসে যে, সেলুলার জেলের ব্যারাকগুলিকে ভেঙ্গে ফেলার এক পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তখন তাঁরা নিজেরাই একটা ব্যবস্থা করে পাঁচজনের একটি প্রতিনিধিদলকে পোর্টব্লেয়ারে পাঠান। তাঁরা সেখানে গিয়ে দেখেন, কয়েকটি ব্যারাক ইতিমধ্যেই ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। সেলুলার জেলটিতে ছিল একটি সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে কোনাকুনিভাবে প্রসারিত সাতটি বাহু (ব্যারাক)। আমাদের প্রতিনিধিরা দেখেন, যথাক্রমে দুই, তিন, চার এবং পাঁচ নম্বর বাহুগুলি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। একটি

ভেঙেছিল জাপানীরা, ইঁটগুলি নিয়ে সমুদ্রের ধারে "পিলবক্স" (Pill-box) তৈরী করেছিল। বাকী তিনটি ভাঙা হয় সম্ভবতঃ ষাটের দশকের গোড়াতে। সেখানে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থের স্মৃতিতে হাসপাতাল তৈরী হবে। আমাদের বন্ধুরা অবস্থা দেখে মর্মাহত হলেন। তাঁরা ফিরে এসে যখন আমাদের কাছে বিবরণ দিলেন, আমরাও মর্মাহত হলাম। অন্যান্য দেশে মুক্তিযুদ্ধের স্মারকগুলিকে অমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধরূপে রক্ষা করা হয়ে থাকে। এখানে তার বিপরীত। জেলের অবশিষ্ট রয়েছে সামনের দুদিকের প্রাচীর, সেন্ট্রাল টাওয়ার, আর তিনটি বাহু—এক, সাত ও ছয়। শোনা গেল, সেন্ট্রাল টাওয়ারটি রেখে অন্য দুটি বাহুকে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা আছে। সাত নম্বর বাহুটি বর্তমানে স্থানীয় জেল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ছয় নম্বরটি সাময়িক-ভাবে "ব্যাচেলরস্ মেস" (অবিবাহিত সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান) হিসাবে। পোর্টব্লেয়ারে পৌঁছাবার পরে আমাদের বন্ধুদের অবশ্য কতকগুলি আনন্দকর অভিজ্ঞতাও হয়। চীফ্ কমিশনার তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। থাকবার কোনও ব্যবস্থা হয়নি জেনে নিজের অতিথি হিসাবে সরকারী বিশ্রামভবনে থাকার অনুমতি দিলেন। অন্যান্য সুবিধাও দিতে দ্বিধা করেন নি। সহকারী চীফ্ কমিশনার ভদ্রলোক নিজেই সেলুলার জেল, এবং "পেনাল সেট্লমেন্ট" (দণ্ডিত বন্দীদের উপনিবেশ) হিসাবে আন্দামানের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি আমাদের বন্ধুদের সঙ্গে সাগ্রহে আলাপ-আলোচনা করেন। তাঁর ধারণা ছিল, প্রাক্তন আন্দামান বন্দীরা সবাই নিশ্চয়ই পক্বকেশ, এবং ন্যুব্জপৃষ্ঠ হবেন। আমাদের বন্ধুরা ঠিক অতখানি বৃদ্ধ হননি দেখে তিনি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, "আপনারা সেলুলার জেলে ছিলেন! আপনাদের বয়স কত?" বন্ধুরা জবাব দিলেন, "আমরা সবাই পঞ্চাশোর্ধ। ষাটের কোঠায় পা দিতে চলেছি। আমরাত' সবাই খুব অল্পবয়সে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম।"

প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সেলুলার জেলের প্রাক্তন সিপাই-সান্ত্রী, যারা এখন অবসর গ্রহণের পর ওখানেই বসবাস করছে, তাদের সঙ্গে বন্ধুদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিলেন। আকাশবাণী পোর্টব্লেয়ার কেন্দ্র থেকে তাদের বেতারভাষণও প্রচারিত হল। বর্তমানে পোর্টব্লেয়ারে বসবাসকারী কয়েকজন উদ্বাস্তু বাঙালী ব্যবসায়ী বন্ধুদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। নাগরিক সম্বর্ধনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মোট কথা, বেশ বোঝা গেল, পোর্টব্লেয়ারের সরকারী ও বে-সরকারী বাসিন্দাদের চোখে প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের মর্যাদার আসন বেশ উঁচুতে।

ফিরে আসার পর মৈত্রীচক্রের পক্ষ থেকে কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলন ডাকা

হয়। তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনের জন্য নয়াদিল্লী অভিযান। তদানীন্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন প্রতিনিধিদলের বক্তব্য খুব মনোযোগের সংগে শোনেন। সম্মানভাতা, এবং সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারকরূপে ঘোষণা, দুটি দাবীকেই তিনি খুব যুক্তিসঙ্গত বলে স্বীকার করেন। এর পিছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে একটা ছোট্ট কারণও ছিল। সেলুলার জেল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে কিনা, অথবা ভাংগার কোনও পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা, এই সম্পর্কে কিছুদিন আগে সংসদে প্রশ্ন করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে বলেন, জাপানীরা যা ভেংগেছিল, তারপরে আর কিছু ভাংগা হয়নি। পরিকল্পনা সম্বন্ধে সঠিক কি বলেছিলেন, আমার মনে নেই। আমাদের বন্ধুরা যখন বাস্তব সত্যটি তাঁর সামনে তুলে ধরেন, তখন স্বভাবতঃই তিনি একটু বেকায়দায় পড়েন। সমস্তকিছু মিলিয়ে ফলাফল ভালই হল। সম্মানভাতা মঞ্জুরীর বিষয়টি যথাসত্বর কার্যকরী করা হবে, এবং দ্বিতীয় দাবিটি নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে বাস্তব রূপায়ণে কিছু দেরী হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমাদের প্রতিনিধিরা তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রসচিবের সংগেও সাক্ষাৎ করেন। দেখা গেল, ভদ্রলোক ঝানু ব্যুরোক্রাট। স্বাধীনতা আন্দোলন নামে কোন বৃহৎ ঘটনা ভারতের ইতিহাসে সংঘটিত হয়েছে কিনা, সে সম্বন্ধে তিনি খুব অবহিত বলে মনে হল না। বন্ধুদের কাছে তিনি মন্তব্য করলেন, "আপনারাত' দণ্ডিত হয়েছিলেন হত্যা, ডাকাতি, বে-আইনী অস্ত্র রাখা ইত্যাদির অভিযোগে। এগুলি কি করে রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হতে পারে?" প্রতিনিধিদের একজন জবাব দিলেন, "আপনারা যাঁকে জাতির জনক বলে স্বীকার করেন, তিনি রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দিয়ে আমাদের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।" এর পরে অবশ্য ভদ্রলোক আর কিছু বলেন নি। সচিবপুংগবের সংগে সাক্ষাতের অভিজ্ঞতায় আমাদের বন্ধুরা উপলব্ধি করেন যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী, এবং সংসদের উভয় কক্ষের বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট সদস্যদের সংগে দেখা ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। তখন দুজন প্রাক্তন আন্দামান বন্দী সংসদ সদস্য ছিলেন। একজন গণেশ ঘোষ, অপরজন কমল তেওয়ারী। কমল তেওয়ারী লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী ছিলেন। তিনি কংগ্রেসপ্রার্থী হিসাবে বিহারের কোন কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হন। এঁরা দুজনেই দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধিদের যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রধানমন্ত্রী যথেষ্ট সহানুভূতির সংগে বক্তব্য শোনেন। সংসদ সদস্যরাও সহানুভূতিশীল। তাঁরা যথাসাধ্য করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের অন্য রাজ্যের মানুষেরা যে

বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন, তার পরিচয় রাজ্যসভার সদস্য থাকার সময় আমিও পেয়েছি।

কয়েক মাস পরে পেন্‌শন্‌ মঞ্জুরীর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে দেখা গেল তাতে আমলাতন্ত্রের দারুভূত মস্তিষ্কের (Wooden headedness) স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এমন কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যার ফলে আমাদের মধ্যে মাত্র সামান্য কয়েকজন পেন্‌শন্‌ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেন। বন্ধুরা দাবী করেছিলেন নিঃশর্তে পেন্‌শন্‌। বিজ্ঞপ্তিত যে সব শর্ত দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি রাজনৈতিক দিক দিয়ে অমর্য্যাদাকর নয় ঠিকই, কিন্তু কিভাবে আমাদের পক্ষে গ্রহণের অযোগ্য, অথবা বিধিনিষেধ আরোপিত, তার দুটির উল্লেখ করছি। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যাঁরা একটানা পাঁচ বছর সেলুলার জেলে কাটিয়েছেন, তাঁরাই পেন্‌শন্‌ পাবেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁদের বাৎসরিক আয় পাঁচহাজার টাকার কম, তাঁরাই যোগ্য বিবেচিত হবেন। প্রথম শর্তটি গ্রহণের একেবারেই অযোগ্য। দ্বিতীয়টি সাময়িক-ভাবে মেনে নিয়ে পরিবর্তনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামানে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ১৯৩২ সালে। দণ্ডের মেয়াদ পাঁচবৎসর বা তার বেশী হলেই আন্দামানে পাঠানো হত। বেশ কিছুসংখ্যক ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ এর মধ্যে দণ্ডিত হয়েছিলেন। আন্দামানে পাঠানোর আগে তাঁদের কয়েক বছর মেয়াদ খাটা হয়ে গিয়েছে। অন্যদের পাঠানো হয় বিভিন্ন সময়ে। শেষ দলটি দেশে ফিরে আসে ১৯৩৮ সালের গোড়াতে। ইতিমধ্যে নানা কারণে কাউকে কাউকে দেশের জেলে ফেরৎ পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং সেলুলার জেলে একটানা পাঁচ বৎসর অনেকেরই কাটানো হয়নি। আমাদের প্রতিনিধিরা আবার ছোটেন নয়াদিল্লীতে। আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যদের কাছে ডেপুটেশন। সংসদ সদস্যরা সকলেই সভায় এই মর্মে মতপ্রকাশ করেন যে, "আন্দামান বন্দীদের পেন্‌শন্‌ দেওয়া উচিত দয়ার দান হিসাবে নয়, তাঁদের কাছে দেশের কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতিরূপে।" ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, এবং প্রয়াত ভূপেশ গুপ্ত জোরালো যুক্তিতে সরকারী বিজ্ঞপ্তির শর্ত-গুলির সমালোচনা করেন। সংসদ সদস্যদের কেউ কেউ বলেন, "যদি কোনও বন্দী সেলুলার জেলে সাতদিনও কাটিয়েছেন, তাঁকেও পেন্‌শন্‌ দিতে হবে।" শেষ-পর্য্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন, "পেন্‌শন্‌ দেওয়া হবে দাক্ষিণ্যরূপে নয়, তাঁদের কাছে জাতির ঋণের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মানভাতা হিসাবে।" তবু দুটি ব্যবহারিক শর্ত সাময়িকভাবে রয়েই গেল। দণ্ডের মোট মেয়াদ পাঁচ বছর হতেই হবে। বার্ষিক আয়ের ঊর্দ্ধসীমাও যথাপূর্বং রয়ে গেল।

মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তারা ঠিক করলেন, যতটুকু পাওয়া গিয়েছে, তা যখন অসম্মানজনক নয়, তখন আপাততঃ গ্রহণ করে শর্তগুলি পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কয়েক বছর পরে অবশ্য শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে আসার পরে বাকী শর্তগুলিও উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সেলুলার জেলের স্বীকৃতির প্রশ্নটি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে টালবাহানা চলতে থাকে। মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তারা স্থির করলেন, আমাদের সবারই বয়স হয়ে চলেছে। এক রসিক বন্ধুর কথায়, "আমাদের প্রত্যেকেরই পাসপোর্ট তৈরী হয়ে আছে। এখন যমরাজা কবে কার জন্যে 'ভিসা' ইস্যু করেন তার অপেক্ষায় আছি।" যমরাজা তো আগেভাগে জানিয়ে ভিসা ইস্যু করেন না! কার কখন ডাক আসবে, কাকে "এক্সটেন্‌শান" দেওয়া হবে, তা তিনিই জানেন। অতএব সরকারের অপেক্ষায় বসে না থেকে নিজেদেরই উদ্যোগে আন্দামান ঘুরে আসার ব্যবস্থা করতে হবে। না হলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "এ যুগের তীর্থদর্শন বাকী থেকে যাবে।"

পোর্টব্লেয়ারের যে সব বাঙালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে ইতিপূর্বে যোগাযোগ হয়েছিল, তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মৈত্রীচক্রের কর্তারা জাহাজ চলাচল বিভাগের কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে সদলে আন্দামান যাত্রার আয়োজন করেন। যাতায়াতের ব্যয় কিছুটা মৈত্রীচক্রের সংরক্ষিত তহবিল থেকে, কিছুটা প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে নিম্নতম একটা পরিমাণ সংগ্রহের দ্বারা যতটা সম্ভব যোগাড় হবে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সহ আরো দু একটি রাজ্যের সরকারের কাছ থেকে ভাল রকম অনুদান পাওয়া গেল। বাংলাদেশ তখন জন্ম নিয়েছে। সেখানে যে সব আন্দামান বন্দী ছিলেন, তাঁদের যাতায়াতের জন্য অনুদানের অনুরোধ শেখ মুজিবর রহমান আনন্দের সঙ্গেই পূরণ করেন। তীর্থযাত্রীদের দলে যোগ দিলেন বন্দীদের আত্মীয় পরিজন ছাড়াও মূল ভূখণ্ডের কিছু কিছু বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী। বেসরকারী উদ্যোগে গেলেও পোর্টব্লেয়ারে তাঁরা স্থানীয় প্রশাসন, এবং নাগরিকদের কাছে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

১৯৭৪ সালের তীর্থযাত্রায় আমি যোগ দিতে পারিনি স্বাস্থ্যের কারণে। বন্ধুদের মধ্যে কয়েকজন, বিশেষতঃ প্রফুল্ল সান্যাল (১৯৩৪ সালে উত্তরবঙ্গে হিলি রেলস্টেশন আক্রমণের অন্যতম নায়ক) যথেষ্টই পীড়াপীড়ি করেন। তাঁকে বলি, "সরকারের পক্ষ থেকে যখন নিমন্ত্রণ আসবে, এবং সরকারী ব্যবস্থায় যাতায়াত হবে, তখন যাব।"

ইতিমধ্যে ভারতে জরুরী অবস্থা জারী হয়ে গিয়েছে। তখন নয়াদিল্লীতে ডেপুটেশন নিয়ে কতটা সুবিধা হবে, সে বিষয়ে মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তাদের মনে নানারকম সংশয় ছিল। ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসেন মোরারজী দেশাই। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য ঢালাওভাবে পেন্‌শন্‌ প্রচলন করেন। মোরারজী দেশাই ঐ জিনিষটির খুব বিরোধী ছিলেন। সেবিষয়ে তাঁর বিরূপ মতামত বহুবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর কাছে দরবার করে সুফল হওয়ার আশা সম্বন্ধে সবাই সন্দিহান। তবু ১৯৭৮ সালের শেষের দিকে মৈত্রীচক্রের এক প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লী যাত্রা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রয়াত সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসু। জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে দেশাইয়ের খুব হৃদ্যতা ছিল। প্রতিনিধিদল আলোচনার সময়ে বুঝতে পারেন যে আন্দামান বন্দীদের প্রতি মোরারজী দেশাইয়ের মনে গভীর শ্রদ্ধা আছে। তিনি দুটি দাবী অবিলম্বে পূরণ করতে রাজী হলেন। জীবিত আন্দামান বন্দীদের পেন্‌শনের পরিমাণ দুশো টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচশো টাকা করা হবে, এবং সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক হিসাবে ঘোষণার জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

আমাদের বন্ধুরা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ধরণ ধারন সম্বন্ধে এতদিনে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিলেও লালফিতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে কতদিন লাগবে কে জানে। তাই তাঁরা তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঐ ভদ্রলোক আন্দামান বন্দীদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। কালবিলম্ব না করে সংশ্লিষ্ট দুটি নির্দেশনামা জারীর ব্যাপারে নিজে তৎপর হলেন। পেন্‌শন্‌ বৃদ্ধির নির্দেশের অনুলিপি আমাদের হাতে পৌঁছাল ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে। জাতীয় স্মারক ঘোষণার অনুষ্ঠানে যোগদানের চিঠি এল ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে। বন্ধুবর প্রফুল্ল সান্যাল এবার নাছোড়বান্দা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতেই হবে। জ্যোতিষ মজুমদার শুধু পুরানো সহকর্মী ও সহবন্দীই নন, আমাদের দুজনের মধ্যে অতিরিক্ত একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। জ্যোতিষবাবুর গৃহিণী শ্রীমতি নিভা মজুমদার, এবং আমার গৃহিণী একই বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা। দুজনের মধ্যে বেশ অন্তরঙ্গতা আছে। বন্ধুবর খুশু রায় বলেন, "আপনার যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখব।" একটা কথা খুশুবাবুর বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য হয়ে গিয়েছে—"রসেবশে নিয়ে যাব।" যাওয়ার লোভত' খুবই। এ ত' শুধু

একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা নয়, এ ত' আমাদের সেই অতীতের অশেষ দুঃখবরনের স্বীকৃতি। অভিভাবক এবং আত্মীয় স্বজনেরা তখন আক্ষেপ করে বলতেন, "আমরা নিজেদের জীবনটা নষ্ট করেছি"। বিজয়ী বীরের সম্মান নিয়ে আন্দামান থেকে দেশে ফিরেছিলাম, আজ একচল্লিশ বছর পরে সেই আন্দামানে যাবো সরকারীভাবে স্বীকৃত বিজয়ী বীরের সম্মান নিয়ে। তবু পিছুটান কিছুটা ছিল। ১৯৭৫ সালে একবার, এবং ১৯৭৭ সালে আর একবার হৃদ্‌যন্ত্র নামক বস্তুটি কর্মবিরতির নোটিশ দিয়েছিল। কবিগুরুর ভাষায়, "যমরাজার দক্ষিণ দুয়ারের আমন্ত্রণলিপি বুকের বাঁদিকটা ঘেঁষে গিয়েছে।" গৃহিণীরও প্রবল আপত্তি তাকে সঙ্গে যেতে বলায় ছুটি পাওয়ার অসুবিধার অজুহাত দিলেন। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলি। যেতেই হবে। গৃহিণী বললেন, "আমিও যাব।" ভালই হল। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে" কথাটি যে কতখানি সত্য, তা এবারের জাহাজ যাত্রায় ভালভাবেই উপলব্ধি করেছি। তিনি সঙ্গে না থাকলে খুবই অসুবিধায় পড়তে হত। আসরও জমবে ভাল। সঙ্গীদের মধ্যে নিভাদিত' আছেনই, আছেন প্রফুল্ল সান্যালগৃহিণী। দিল্লীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক, এবং প্রবীণ বিপ্লবী ডাঃ সুধাংশুবিমল দাস স-গৃহিণী এই যাত্রায় সঙ্গী হবেন। তাঁদের দুজনের সঙ্গেই আমাদের দুজনের খুবই অন্তরঙ্গতা আছে। ডাঃ দাস স্বল্পভাষী। কিন্তু রসবোধ যথেষ্টই আছে। অমায়িক, বিচক্ষণ, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতির সম্বন্ধে ভালমতই খবর রাখেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত মতামতগুলিতে বিবেচনার প্রখরতা স্পষ্ট।

সাতই ফেব্রুয়ারী বিকালে নেতাজী সুভাষ ডক থেকে জাহাজ ছাড়বে। 'জাহাজটির নাম" হর্ষবর্ধন।"

আমাদের গৃহিণীদের আন্দামান যাত্রার সঙ্গী হওয়ার ইচ্ছার পিছনে সমুদ্র-যাত্রার অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াও আরো একটি বড় কারণ রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের নীরব, অথচ মুখর সাক্ষী সেলুলার জেল। তাঁদের জীবন-সঙ্গীদের যৌবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত হয়েছে ঐ লৌহকারার অন্ধকার কক্ষের অন্তরালে। তাঁদের কাছে ওটি তো তীর্থক্ষেত্রের মতই, অথবা তার চাইতেও পুণ্যভূমি।

আমাদের যাতায়াতের জাহাজ ভাড়া, জাহাজে এবং পোর্টব্লেয়ারে থাকাকালীন খাওয়ার খরচ ভারত সরকার বহন করবে। পোর্টব্লেয়ারে থাকার ব্যবস্থাও ওখান-কার প্রশাসনেরই দায়িত্ব। জাহাজেই থাকার ব্যবস্থা হবে, মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তারা এক সাইক্লোস্টাইল করা বুলেটিনে বিশদ বিবরণ সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন।

যাঁরা আমাদের সংগী হবেন, তাঁদের প্রত্যেকের জাহাজ ভাড়া, এবং খাওয়ার খরচ মোট আড়াইশো টাকা পড়বে। পোর্টব্লেয়ারে থাকাকালীন খরচ নিজেদেরই দিতে হবে। জাহাজে পাওয়া যাবে প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ও নৈশভোজন। সেইজন্যে নিজেদের সংগে চিঁড়ে, মুড়ি, বিস্কুট, পাঁউরুটি, গুঁড়োদুধ, চা এবং ফ্লাস্ক নেওয়া ভাল। জাহাজের রন্ধনশালা থেকে চাইলেই গরম জল পাওয়া যায়। চা বানাবার সরঞ্জাম সংগে থাকলেই হলো। একটা ছোট প্লাষ্টিকের বালতি, এবং মগ থাকা ভালো। "হর্ষবর্ধন" শীততাপনিয়ন্ত্রিত। নতুবা পোর্টব্লেয়ারে এবং সমুদ্রে এখন শীতবস্ত্রের কোনও প্রয়োজন নেই। একটি পুলওভার, পাতলা গরমচাদর এবং হাল্কা বিছানা সংগে নিতে হবে। জাহাজঘাটে কুলি পাওয়া গেলেও ভাড়া অত্যধিক। মালপত্র নিজেদেরই বহন করতে হবে। যতটা সম্ভব হাল্কা হয়, ততই ভালো। কতজন সংগী যাবেন, তাঁদের তালিকা সহ প্রয়োজনীয় অর্থ মৈত্রীচক্রের কোষাধ্যক্ষের কাছে অন্ততঃ সাতদিন আগে জমা দিতে হবে। কলকাতার বাইরে থেকে যেসব প্রাক্তন আন্দামান বন্দী আসবেন তাঁদের রেলে যাতায়াতের জন্য রেল কর্তৃপক্ষ 'ফ্রী পাশ' দিয়েছেন। মৈত্রীচক্রের নেতাদের পরামর্শমতো এই ব্যবস্থা। পাশগুলি (Pass) মৈত্রীচক্রের পক্ষ থেকেই যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৈত্রীচক্রের অফিস পার্কসার্কাসে অবস্থিত। যাত্রার দিন বেলা বারোটার মধ্যে ওখানে পেঁছিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দুখানি বাস জাহাজঘাটে পেঁছে দেবে। যাঁরা নিজেদের ব্যবস্থায় যেতে ইচ্ছুক, তাঁরা সরাসরি ট্যাক্সিযোগে নেতাজী সুভাষ ডকে পেঁছাতে পারেন। গৃহিণীর কনিষ্ঠ-ভ্রাতা শ্রীমান নির্মলেন্দুকে বলায় সে আমাদের সংগে জাহাজঘাটে যেতে রাজী হল। সুতরাং বাসা থেকে ট্যাক্সিযোগে সরাসরি সেখানে যাওয়াই সুবিধাজনক স্থির করি।

৫

আন্দামানের যাত্রী একচল্লিশ বছর পরে

নেতাজী সুভাষ ডকে পৌঁছে দেখি পুরাতন সহবন্দীরা অনেকেই এসেছেন। সঙ্গী হিসাবে এসেছে কারুর গৃহিণী, কারুর পুত্রকন্যা বা আত্মীয়জন। যাঁদের আত্মীয়স্বজনের বালাই নেই, তাঁরা ঘনিষ্ঠ পরিচিত জনকে যাত্রার সাথী হিসাবে নিয়ে এসেছেন। এ রকম সরকারী বন্দোবস্তে বেশ কয়দিন সমুদ্রযাত্রার সুযোগ ত' কম লোভনীয় নয়! যাঁরা বয়স্ক, তাঁদের মনে ঐতিহাসিক সেলুলার জেল চোখে দেখার আগ্রহটাই বেশী। যারা তরুণ, তাদের কাছে ভ্রমণটাই বড়। প্রাক্তন বন্দীরা আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কয়েকজনকে সঙ্গে নিতে পারবেন। আমাদের কারুর কারুর মত ছিল, সঙ্গীর সংখ্যা সম্বন্ধে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। কিন্তু মৈত্রীচক্রের সাধারণ সম্পাদক সেটা মানতে রাজী না হওয়াতে সঙ্গে এমন কিছু লোকও এসেছে অতিথি হিসাবে, যারা এই যাত্রার মর্যাদারক্ষার পক্ষে উপযুক্ত কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মূল ভূখণ্ডে যাঁদের বন্দীজীবন কেটেছে, এমন কয়েকজন প্রবীন ও খ্যাতনামা বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীও মৈত্রীচক্রের আমন্ত্রিত অতিথিরূপে এসেছেন। তাঁদের কয়েকজনকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি, কয়েকজনের সঙ্গে বন্দীশিবিরে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়েছে, আবার কয়েকজনকে শুধু নামেই জানি।

প্রতীক্ষা হলে পৌঁছে যাকে বলে একেবারে নরকগুলজার। এক একজনের সঙ্গে দেখা হয়, কুশল বিনিময় এবং সমাচার আদানপ্রদানের পালা চলে। প্রথমেই দেখা বিশ্বনাথ মাথুর এর সঙ্গে। তিনি অন্য দুজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। অনুমানে বুঝি, আমাদের অতীত বন্দীজীবনের সঙ্গী। শরীরের কাঠামোতে এখনও বলিষ্ঠতার চিহ্ন রয়েছে। মুখে এবং মাথার চুলে বার্ধক্যের ছাপ সুস্পষ্ট। চিনি চিনি করি, অথচ ঠিক চিনে উঠতে পারি না। বিশ্বনাথ মাথুর একজনকে দেখিয়ে বলেন, "ইনি যোগেন শুকুল"। খটকা লাগে। একদা 'বিহার কা শের' নামে খ্যাত যোগেন শুকুল অনেকদিন হল প্রয়াত বলে শুনেছি। আমার অবস্থা দেখে সেই বন্ধুটি হেসে বলেন, "আমি শিউ বর্মা। অপরজন জয়দেব কাপুর।

যোগেন শুকুল তো মারা গিয়েছেন"। শিউ বর্মা আর জয়দেব কাপুর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির এবং অবিভক্ত বাংলার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সেক্রেটারিয়েটের প্রাক্তন সদস্য সুধীন রায়, ওরফে খোকা রায় এসেছেন। পরবর্তীকালে তিনি পূর্বপাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা হন, এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে চলে আসেন। সুধীনবাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে সংবাদের আদানপ্রদান, এবং চিন্তা বিনিময় চলে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরাও এসেছেন। দু-একজনের সঙ্গে কথাও হল। তবে ফিরে এসে জেনেছি, কলকাতার বৃহৎ সংবাদ-পত্রগুলিতে আমাদের আন্দামান যাত্রা, এবং সেলুলার জেলকে জাতীয় স্মারক ঘোষণার ব্যাপারটি তেমন গুরুত্বলাভ করেনি। শুধু কয়েকটি সংবাদপত্রে একটি ফটো ছাপা হয়েছিল। আটানব্বই বছর বয়স্ক আগ্রীবালম্বিত শুভ্রকেশ পণ্ডিত পরমানন্দকে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সাহায্য করছেন বঙ্গেশ্বর রায়। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত মন্মথ গুপ্ত আমাদের সাথী হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর ফিরে এসে কিছুদিন পত্রালাপ চলে। মন্মথবাবুর চিঠিতে জেনেছি, উত্তর-প্রদেশের হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে আন্দামান যাত্রার খবর অনেকখানি জুড়ে ছাপা হয়েছিল। তিনি নিজে ফিরে আসার পর "আন্দামান-দি-গুঞ্জ" (আন্দামানের আওয়াজ) নামে একটি রিপোর্টাজ একটি হিন্দী সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। মৈত্রীচক্রের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সর্দার পৃথ্বী সিং আজাদ, গণেশ ঘোষ, এবং ডাঃ ভূপাল বসু সঙ্গে চলেছেন। আমরা যখন প্রতীক্ষা হলে পৌঁছাই, তখন গণেশবাবু এবং মৈত্রীচক্রের অন্যতম সম্পাদক, হিলি রেলস্টেশন আক্রমণের অন্যতম নায়ক, আমার অনুজপ্রতিম সত্য চক্রবর্তী জাহাজ কর্তৃপক্ষের অফিসে যাত্রার আনুষ্ঠানিক কাজগুলি সমাধা করছেন। সত্য চক্রবর্তী, এবং মৈত্রী-চক্রের কোষাধ্যক্ষ গোপাল আচার্য্য একবারও আন্দামান যাত্রায় যোগ দেননি। অথচ প্রত্যেকবারই যাত্রাসংক্রান্ত ব্যবস্থাদি যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় এঁদের অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। জাহাজের টিকিট, এবং অন্যান্য কাগজপত্র মৈত্রীচক্রের যেসব কর্মকর্তা সঙ্গে যাবেন, তাঁদের হেফাজতে থাকবে। জাহাজে অবস্থান, এবং পোর্টব্লেয়ার পরিদর্শন সংক্রান্ত সাংগঠনিক ব্যবস্থায় বিশ্বনাথ মাথুর-এর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল। খুঁটিনাটি কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন জ্যোতিষ মজুমদার, খুশু রায়, সমর ঘোষ, বিমলেন্দু চক্রবর্তী। আরও দু-একজন বন্ধুর নাম বাদ পড়ে যেতে পারে। তাঁদের কাছে ত' আগেভাগেই ক্ষমা চেয়ে রেখেছি।

আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম শেষ হলে জাহাজে ওঠার জন্য সবাইকে 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াতে হল। আমার ভয় ছিল, গ্যাংওয়ে দিয়ে উঠতে অসুবিধা হবে। গ্যাংওয়ে হল, দু'খানি প্রশস্ত এবং দীর্ঘ তক্তা পাশাপাশি এবং ঢালুভাবে জাহাজের উপরের ডেক থেকে জেটি পর্যন্ত প্রসারিত। দেখে আশ্বস্ত হলাম, ভয়ের কারণ নেই। আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য আলাদা সিঁড়ির ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রতীক্ষা-হলে পৌঁছাবার পর কখন যে দুঘণ্টা কেটে গিয়েছে, টের পাইনি। প্রায় হট্টমেলার মতই গুঞ্জনে বাতাস গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আমার বেশী কথাবার্তা বলা নিষেধ। তবে সে নিষেধের বেড়া আজ কখন যেন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। সবাই ফিরে গিয়েছি সেই চার দশক পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে। দেহের না হলেও মনের বয়স হঠাৎই যেন কমে গিয়েছে। তবু বর্তমানকে কি একেবারে ভোলা যায়! 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে একটা কথাই মনে হচ্ছিল, জাহাজে তো আসন সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। কোথায় জায়গা পাব, অনিশ্চিত। শ্রীমান নির্মলেন্দু এবং অন্য বন্ধুদের সহযোগিতায় যেখানে পৌঁছানো গেল, সে জায়গাটি 'B'-স্পেস বা 'ব্লক' নামে পরিচিত। আমরা সিঁড়ি দিয়ে যে জায়গাটায় উঠেছি, সেটা জাহাজের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত লম্বা একটা হলঘরের মতো। উল্টোদিকে আরেকটি দরজা। জাহাজ ছাড়ার আগে দুদিকের দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয়। হলঘরের মেঝেটা কার্পেট মোড়া। দুপাশে, ডাইনে-বাঁয়ে যাতায়াতের কার্পেট মোড়া করিডোর। উভয় দিকের করিডোরের দুপাশে কয়েকটি কামরা, বাঁদিকে A-স্পেস বা ব্লক, ডানপাশে করিডোরের একদিকে ভোজনকক্ষ, রন্ধনশালা, তারপরে দু-একটি কামরা, তারপর উপরের ডেকে ওঠার সিঁড়ি. ডানদিকে খানিকটা কাঠের বেড়া দেওয়া, তারপরে 'লাউঞ্জ' বা যাত্রীদের অবসর বিনোদনের কামরা। তারপর আরো কয়েকটি কামরা। ভোজনের কামরাটি বাঁপাশে রেখে একটু এগোলে নীচে নামার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। কার্পেটে মোড়া। নেমে কয়েক হাত চওড়া জায়গার দুপাশে ডাইনে ও বাঁয়ে B-স্পেসের দুটি বড়ো হলঘর। মাঝখানে একটি ঘরের সামনের অংশে হাতমুখ ধোয়ার জন্য দুটি বেসিন। একটি কলে ঠাণ্ডাজল ও আরেকটি কলে গরমজল পাওয়া যায়। বেসিনটি যে বেড়ার গায়ে, তার ওপারে সামনে হাতখানিক চওড়া ও কয়েক হাত লম্বা একটি করিডোর। সেখানে দুপাশে দুটি স্নানের কামরা, মাঝখানে কয়েকটি পায়খানা। এই ঘরটির দুদিকে দরজা। B-স্পেসের দুটি অংশ থেকেই প্রবেশ করা যায়। বোঝা গেল, যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানারকম ব্যবস্থা আছে। 'কিউ'তে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছি, জাহাজের আলোকসজ্জা, গায়ে ঝোলানো বিরাট ফেস্টুন—তাতে আন্দামান

নির্বাসিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বাগত জানানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের জাহাজ ও পরিবহন দপ্তরের উপদেষ্টা কমিটির সভ্য সংসদ সদস্যরাও 'হর্ষবর্ধনে'র যাত্রী। তাঁদের সঙ্গে আছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী চাঁদ রাম। উপদেষ্টা কমিটির সভ্যদের স্বাগত জানিয়েও ফেস্টুন ঝোলানো। বোঝা যাচ্ছে, 'হর্ষবর্ধন'এ এবার অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে।

যে ভাবনার কথা একটু আগে বলেছি, সেটি ছিল জাহাজে উঠে সুনিশ্চিত জায়গায় "বাঙ্ক" পাওয়া যাবে কিনা।

দেখা গেল, শেষ পর্যন্ত ঐ হলে কাছাকাছি বাঙ্কগুলিতে স্থান পেয়ে গেলাম আমরা কয়েকজন, যাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে। স্ব-গৃহিণী এবং ভ্রাতা ডাঃ এস. বি. দাস, জ্যোতিষ মজুমদার এবং নিভাদি, প্রফুল্ল সান্যাল, সান্যালগৃহিণী ও পালিতা নাতনী বুলি, বহুদিনের সহকর্মী ও সহবন্দী দ্বিজেন তলাপাত্র। এই হলেই একটু দূরে রয়েছেন গণেশ ঘোষ, সঙ্গে তিনটি মহিলা এবং একজন তরুণ। চট্টগ্রাম বিপ্লবকাণ্ডের অন্যতম অগ্রণী কর্মী কালীকিংকর দে চলেছেন কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে। কালীবাবু আমার দীর্ঘদিনের সহবন্দী। দেশবিভাগের পর পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে গিয়েছিলেন। তিনি ভারতে চলে আসেন ১৯৬৫ সালে।

তখন দেখা গেল, আমার অজানিতে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। আমার গৃহিণী চট্টল * কন্যা। কালীবাবু বিয়ে করেছেন আমার গৃহিণীর এক বোনঝিকে। সম্পর্কটা খুব দূরের নয়। সুতরাং তিনি হলেন কালীবাবুর মাসীশাশুড়ি। সেই সুবাদে আমি হলাম কালীবাবুর মেসো-শ্বশুর। সম্পর্কটা জানাজানি হওয়ার পর আমাদের উভয়ের পরিচিত বন্ধুমহলে হাস্যকৌতুকের উপাদান যুগিয়েছিল। অতএব কালীবাবুর কন্যা কল্যাণীয়া মৃদুলা আমার নাতনী। বৃদ্ধবয়সে নাতনীদের সম্বন্ধে বেশ খানিকটা আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। এই মেয়েটি গায়িকা, সুশ্রী, মৃদুভাষিণী, তবে চপলা নয়। জাহাজে থাকাকালে কয়েকদিন চা বানিয়ে খাইয়েছে। ডেকে বায়ুসেবনের সময়ে একদিন তাকে মনোযোগী শ্রোতা হিসাবে পেয়ে বুঝিয়েছি কিভাবে প্রহরে প্রহরে সমুদ্রের মেজাজ বদলায়। প্রকৃতির বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন মেজাজের অন্তর্নিহিত সুরটি নিয়েই তো ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের রাগরাগিণীর সৃষ্টি হয়েছে। রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুবই সামান্য। বলা যায়, রসের ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করছি। সৌভাগ্যের বিষয়, নাতনীটির জ্ঞানের পরিধিও খুব বেশী নয়। সুতরাং আমার অজ্ঞতা তার কাছে ধরা পড়ে নি, বরং খানিকটা মুগ্ধ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। কারণটা স্বাভাবিক। রাগ-রাগিনী সম্বন্ধে আমার

* চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম।

যেটুকু নেহাৎই ভাসা-ভাসা ধারণা আছে, বেশীর ভাগ রাজনৈতিক কর্মীর সেটুকুও নেই।

বাংকগুলি রেলের টু-টায়ার স্লীপিং বার্থের ধরনে তৈরী। তবে পিছনদিকের বেড়ার উপরের দিকটা জাল দেওয়া। বাংকে বসে পাশের বাংকের যাত্রীদের সংগে স্বচ্ছন্দে গল্পগুজবে সময় কাটিয়ে দেওয়া চলে। এক-এক লাইনে ছয়টা করে বাংক। মাঝখান দিয়ে পা রাখার জায়গা। আমরা যেগুলিতে, সেগুলি অন্যান্য সমান্তরাল বাংকগুলির যেন শিয়রের দিকে সাজানো। মাঝখানে বেশ প্রশস্ত খানিকটা জায়গা। পাদচারণা করা চলে। রাতে শতরঞ্জি পেতে তাসখেলার আসর বসবে। ঐ হলেরই পিছনের দিকে মহিলাদের জন্য কয়েকটি আলাদা স্নান ও শৌচাগার রয়েছে। এদিক দিয়ে যে অসুবিধা হওয়ার আশংকা ছিল, দেখা গেল তাও নেই। প্রত্যেকটি 'স্পেস' বা 'ব্লক' একই ধাঁচে তৈরী। C ব্লকটি আমাদের নীচে, কয়েক ধাপ নেমে যেতে হয়। বংগেশ্বরবাবুরা রয়েছেন সেখানে। কর্মকর্তাদের মধ্যে আমাদের ব্লকে আছেন জ্যোতিষ মজুমদার ছাড়া সমর ঘোষ, এবং বিমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রত্যেকটি ব্লকে কর্মকর্তাদের দু'তিনজনের উপর আমাদের সংগে যোগাযোগ রাখা, প্রয়োজনীয় খবর পেঁাছে দেওয়া, এবং আনুসংগিক ব্যাপারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিছানা পেতে সরঞ্জাম সাজিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসতে না বসতেই মৈত্রীচক্রের কর্মকর্তারা "ব্যাজ" বিতরণ করে গেলেন। যাঁরা প্রাক্তন বন্দী, তাঁদের একধরনের "ব্যাজ", আর যাঁরা এসেছেন আমাদের সংগী, তথা আমন্ত্রিত হয়ে, তাঁদের জন্য আর এক ধরনের "ব্যাজ।" দেখতে বড় বড় সম্মেলনের কর্মকর্তাদের যে ধরনের "ব্যাজ" দেওয়া হয়, অনেকটা সেইরকম। এইগুলি জামায় আঁটা থাকলে জাহাজের সর্বত্র, অর্থাৎ ডাইনিং হলে, লাউঞ্জে এবং ডেকে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করা যাবে।

জাহাজে সাধারণ যাত্রী খুব কম। আমরা ছাড়া যারা আছে, তারা হল 'সি. আর. পি.'র জওয়ানরা। তারা চলেছে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য। তারা জেনে গিয়েছে, আমরা সবাই হলাম "আজাদীর সিপাহী"। কেউ কেউ শুনেছে, 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র সিপাহী। মোটকথা, আমরাও ফৌজী আদ্‌মী। সুতরাং বেশ সম্ভ্রমের সংগেই কথাবার্তা বলে।

কিছুক্ষণ পরে জাহাজের মাইক থেকে ঘোষণা করা হল, "বাইরের লোক যাঁরা আছেন, এখুনি নেমে যান, জাহাজ ছাড়বে।" তখন সন্ধ্যা সাতটা। ক্রমে জেটির রেখা দূরে অপসৃয়মান, কাল সকালে স্যাণ্ডহেড্‌স্ (Sandheads) এ পেঁাছবে।

তারপর জোয়ারের প্রতীক্ষা। অনুকূল সময় এলে নোঙর তুলে সাগরের বুকে পাড়ি দেবে।

মাইক থেকে ভেসে এল নরেশ গাঙ্গুলীর কণ্ঠস্বর—"ডাইনিং হলে পঁচাত্তরটি আসন আছে। এক এক ব্লক ধরে ডাকা হবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, সকলে সুশৃংখলভাবে এসে ভোজনপর্ব শেষ করে চলে যাবেন। তারপর আবার অন্য ব্লকের বন্ধুদের ডাকা হলে তাঁরা আসবেন।" 'সুশৃংখল' কথাটির ব্যবহারে বন্ধুবর হরিপদ দে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। হরিপদবাবু আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সহবন্দী। তিনি অভিজ্ঞ, প্রবীন কর্মী। স্বল্পভাষী, সংযত আচরণ। ক্ষোভটা অস্বাভাবিক নয়। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলি, "আমাদের এবারকার সহযাত্রীদের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ছাড়াও বেশ কিছুসংখ্যক মানুষ রয়েছে। তারা আমাদের মত শৃংখলায় অভ্যস্ত নয়। ১৯৭৪ সালের বেসরকারী তীর্থযাত্রার সময় জাহাজের কর্তৃপক্ষের সংগে এবং সাধারণ যাত্রীদের সংগে কিছুটা তিক্ততা ও বাদানুবাদ সৃষ্টি হয়েছিল বলে শুনেছি। সম্ভবতঃ সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের কর্মকর্তারা নরেশবাবুকে ঐভাবে অনুরোধ জানাতে বলেছেন।"

নরেশ গাংগুলী পোর্টব্লেয়ারে চীফ কমিশনারের সদর দপ্তরে 'পার্সোনেল' (Personnel) বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী। আমাদের সুখ-সুবিধা ইত্যাদির ব্যাপারে তত্ত্বাবধানের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে তাঁকে নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি শুধু সরকারী নির্দেশের খাতিরেই নয়, নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতার সংগে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করেন। একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। ৭ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল পর্যন্ত, তিনি প্রায় সারাক্ষণই আমাদের সংগে থেকেছেন। প্রত্যেকের সুবিধা অসুবিধার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। প্রত্যেকের সংগেই তাঁর একটা নিবিড় আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

প্রবাসী বাঙালীদের আতিথেয়তার যে কাহিনী প্রায় ভুলতে বসেছিল, তা যেন আবার চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে।

ডাইনিং হলে শৃংখলা রক্ষা করা অবশ্য শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে ওঠে নি। দেখা গেল, তাতে সকলের খাওয়া শেষ হতে অনেক দেরী হবে। আমাদের জন্য জাহাজ-কর্তৃপক্ষের বিশেষ ব্যবস্থার একটি দৃষ্টান্ত দিই। ডাইনিং হলের বাইরে একটি কাউন্টার আছে। সাধারণতঃ যাত্রীদের সেখানে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কুপন কিনতে হয়। কুপন দেখিয়ে খাদ্যবস্তু পাওয়া যায়। 'সি. আর. পি'. র জওয়ানদের সেই নিয়মই অনুসরণ করতে হয়েছে। আমরা "ব্যাজ"-এর জোরে কামরায়

ভিতরে ঢুকে যে চেয়ারগুলি খালি আছে, সেগুলিতে বসতে পেরেছি। "বাংক" যাত্রীরা 'ফ্রন্ট ডেক', বা সামনের ডেক ছাড়া অন্য ডেকদুটিতে, যথা উপরের ডেক এবং সুইমিং পুলের ডেক এ যাওয়ার অধিকারী নয়। আমাদের বেলায় সেই নিয়ম প্রযোজ্য হয় নি।

'ডাইনিং হল'এ আমাদের খাদ্য পরিবেশন বাবুর্চিদের পক্ষে খুব সহজ ছিল না। আমরাই রয়েছি সর্বসাকুল্যে প্রায় সাড়ে তিনশ জন। বাবুর্চিরা একটা এ্যালুমিনিয়ামের থালিতে একই সঙ্গে ভাত, ডাল, তরকারী, মাংস সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটির জন্য থালির মধ্যে আলাদা আলাদা খোপ করা। ভাত নষ্ট হচ্ছে প্রচুর। কে সেদিকে নজর দেয়, বা কার কথা শোনে! বাবুর্চিরা কাজ করে চলেছে যন্ত্রের মতন। সকালের বরাদ্দ দুই পিস্ কাঁচা পাঁউরুটি মাখন মাখানো, আর একটি ওমলেট। দুপুর আর রাত্রের খাওয়াটা একই রকম। নিরামিষ-ভোজীদের জন্য মাছ বা মাংসের বদলে অতিরিক্ত একটা সব্জী। যাঁরা রাতে চাপাটি খেতে অভ্যস্ত, তাঁদের প্রথম দিনটা বেশ অসুবিধা হয়েছিল। পরে জাহাজের ডাক্তার শ্রীচক্রবর্তীকে বলায় তাঁর নির্দেশে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের চাপাটি পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়।

প্রথম সন্ধ্যার ভোজনপর্ব সেরে এসে প্রায় সবাই সে রাতে শয্যার আশ্রয় নিলাম। পরের দিন ভোর না হতে দেখা গেল, গঙ্গার দুপাশে চটকল। একদিকে দেখা যায় বজ্‌বজ্ আর বিড়লাপুর, এবং অন্যদিকে হলদিয়াকে পিছনে ফেলে রেখে জাহাজ চলেছে। তখনও মোহনায় পেঁছায় নি। তাই গতিবেগ মন্থর। সন্তর্পনে জলের বুকে ভেসে ওঠা চরের পাশ দিয়ে যেতে হচ্ছে। চা-পানের পর্ব শেষ হলো। জাহাজের মাইকে ভেসে এলো ঘোষণা—"আমরা এখন কপিলদ্বীপের মুখে এসে নোঙর করেছি। ক্যাপটেন জন জাহাজের দায়িত্ব নিলাম। রাত আটটায় নোঙর তুলে সাগরের বুকে পাড়ি জমাবো।"

সেদিন সারাটা দিন কাটে স্মৃতিচারণ, এবং স্মৃতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার সহবন্দীরা বহু বছর আগে একই জাহাজে আন্দামান গিয়েছিলেন। কথার ফাঁকে ফাঁকে সেদিনের যাত্রার অভিজ্ঞতার টুকি-টাকি ঝিলিক মারে। যে সব প্রাক্তন বন্দী অন্যান্য সময়ে গিয়েছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার টুকরোও জুড়ে দেন। এমনিভাবে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির বহু ঘটনা আবার নতুনভাবে মনে পড়ে যায়।

রাত আটটার সময়ে মাইকে ঘোষণা ভেসে আসে—"আমরা এখন নোঙর তুলে সাগরের বুকে পাড়ি জমাবো।" অল্পবয়সী যারা, সে দৃশ্য দেখার আগ্রহে ডেকে

চলে যায়। আমাদের হলটিতে মহিলারা 'পোর্ট' হোলগুলির সামনে ভিড় জমান। সি. আর. পি.'র এক নওজোয়ান স্থান করে নিয়েছিল আমার বাঙ্কের সামনে উপরের বাঙ্কটিতে। উপরে ওঠানামার জন্য বাঙ্কের গায়ে একটি ছোট্ট লোহার মই লাগানো আছে। জওয়ানটি নীচে নেমে পাটাতনের উপরে দাঁড়াতেই তার পা টলে যায়। সাগরের ঢেউএর দোলুনি পায়ের নীচে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু টাল খাওয়ার মতো নয়। জওয়ানটিকে জিজ্ঞাসা করি, "পহেলা সফর" ? সে জানায়, "হাঁ"। তার কাছে শুনি, এই যাত্রায় যোগদানের জন্য তাদের ব্যাটেলিয়ানটি বিশেষভাবে তদ্বির করেছিল। সমুদ্রভ্রমণের অভিজ্ঞতার আকর্ষণ তো কম নয়!

পরের দিন সকালে 'ফ্রন্ট ডেক' বা সামনের ডেকে বেড়াতে যাই। নাবিকদের পরিভাষায় এর নাম সম্ভবতঃ "ষ্টার বোর্ড ডেক"। প্রশস্ত ডেকটির চারিধারে কোমর সমান লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। রেলিং ধরে নীচের দিকে তাকালে কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। মাঝখানটিতে খানিকটা জায়গা রেলিং দিয়ে ঘেরা। সেখানে শোয়ানো রয়েছে অতিকায় লোহার নোঙরটি। নোঙর বাঁধার কাছিটি ঠিক যেন রূপকথার অজগররাজের মতো প্রকাণ্ড কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে। সমুদ্র এখন শান্ত। অবশ্য বঙ্গোপসাগরের পক্ষে যতটা শান্ত হওয়া সম্ভব। বড় বড় ঢেউগুলি জাহাজকে দোলা দিয়ে যায়। উপরে সীমাহীন নীল আকাশ, নীচে এক দিকচক্রবাল পর্যন্ত প্রসারিত সীমাহীন জলরাশি—সামনে, পিছনে, ডাইনে, বাঁয়ে। তবে জলের রং নীল নয়, ঘন কালো, যাকে বলে মসীকৃষ্ণ। কবির ভাষায়, "গাঢ় অন্ধকারের রং"। গৃহিণী বলেন, "একেই বলে কালাপানি।"

বৃটিশ আমলে সাধারণ মানুষের মুখে 'দ্বীপান্তর' কথাটির বদলে "কালাপানি" কথাটির প্রচলন ছিল বেশী। "কালাপানি" মানে হয়ে দাঁড়িয়েছিল, দেশ ছেড়ে বহু দূরে এক অজানা বিভীষিকার দ্বীপে নির্বাসন। 'কালাপানি' কথাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মানসনেত্রের সামনে তেতাল্লিশ বছর আগেকার দিনগুলির ছবি সুস্পষ্টভাবে ভেসে উঠল। হারিয়ে যাওয়া অনুভূতির রেশগুলি প্রাণ ফিরে পেল। সেদিন, আর আজকের দিনের তুলনা আপনা থেকেই জীবন্ত হয়ে ওঠে।

৬

দ্বীপান্তরের যাত্রী—তেতাল্লিশ বছর আগে

আমরা, অর্থাৎ আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত বন্দীরা আন্দামানের অভিমুখে যাত্রা করি ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে। যাত্রা করি, অর্থাৎ আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। যাওয়া, বা না যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের মতামতের কোন মূল্য ছিল না। সে প্রশ্নও ওঠে নি। ১৯৩৫ সালের পয়লা মে স্পেশাল ট্রাই-ব্যুনালের রায় প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাইকোর্টের রায় বেরোয় ১৯৩৬ সালে, বোধহয় জুন মাসে। যাদের দণ্ডের মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশী ছিল, এবং বহাল আছে, তাদের সবাইকে আন্দামানে যেতে হবে জানা কথা।

ভারত গভর্নমেন্ট যখন দ্বিতীয় বার দণ্ডিত বিপ্লবী বন্দীদের আন্দামানে নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তখন কেন্দ্রীয় এ্যাসেম্বলীতে স্বরাজ্য দলের সদস্যদের প্রবল প্রতিবাদের মুখে দুটি সুবিধা দিতে রাজী হয়। পাঠাবার আগে বন্দীরা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবে। জেল-কর্তৃপক্ষই ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয়তঃ একটি মেডিক্যাল বোর্ড বন্দীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর সমুদ্রযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত ঘোষণা করলে তবেই পাঠানো হবে।

হাইকোর্টের রায় যখন বেরোয়, তখন আমি রাজসাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে। যথারীতি একদিন জেল অফিস থেকে ডাক এল। ইন্টারভিউ এসেছে। মা, বড় ভাই এবং বড়ভাইয়ের ছেলে দেবেন, তিনজন এসেছেন দেখা করতে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পালা শেষ হওয়ার পর সবাই দুই-একদিনের ব্যবধানে এসে মিলিত হলাম আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে। যে ক'জন দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য হয়েছে, তাদের স্থান হল "বম্‌ব্‌ ইয়াডে", যারা তৃতীয় শ্রেণীর, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট তের নম্বর ডিগ্রী। যাত্রার আগের দিন সন্ধ্যায় সকলের সঙ্গে দেখা হল জেল গেটে। মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য সবাইকে আনা হয়েছে। বোর্ড গঠিত হয়েছে তিনজন সিভিল সার্জনকে নিয়ে।

তাঁরা প্রত্যেকের বুকে স্টেথোস্কোপ ঠেকিয়ে রায় দিলেন, সকলেই সমুদ্রযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত।

যাত্রার দিন সকাল ৯টা-১০টার সময় যাত্রীরা সবাই জেলগেটে মিলিত হলাম। প্রত্যেকের পায়ে ডান্ডাবেড়ী পরানো হল। জেলের ভিতরের দিকের ফটক দিয়ে বাইরের প্রধান ফটকের মাঝখানটায় সবাইকে দুজন পাশাপাশি লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হল। পোর্টব্লেয়ার থেকে একদল পাঠান পুলিশ আনা হয়েছে আমাদের সংবর্ধনা করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। "আন্দামান মিলিটারী পুলিশ", সংক্ষেপে এ. এম. পি. (A.M.P.)। একটা লম্বা শিকলের সঙ্গে অনেকগুলি হাতকড়া পর পর লাগানো। আমাদের একজনের ডানহাত, আর একজনের বাঁহাত, এমনি করে হাতকড়া পরানো হল। হাতে হাতকড়া, পায়ে ডাণ্ডাবেড়ী। বিপ্লবী জীবনে প্রবেশের মুখে যে কথাগুলি শুনেছিলাম গানের কলি হিসাবে, "যারা ডাক দিয়ে গেল বন্দীশালার শিকল ঝঙকারে", তারই সজীব উদাহরণ আমরা, লোহার জাল দিয়ে ঘেরা প্রিজন্‌ভ্যান-কে বাইরের ফটক খুলে ভিতরে ঢোকানো হল। দুপাশে সামনাসামনি বসার লম্বা বেঞ্চের মতো। আমাদের সঙ্গেই উঠলো রাইফেল হাতে A.M.P.-র জওয়ানেরা। জালের ঘেরার ওপারে ড্রাইভারের পাশে সশস্ত্র গোরা সার্জেণ্ট দুজন। আমরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছি, তার পাল্লা দুটি বন্ধ করে তালা এঁটে দেওয়া হল। চাবি থাকবে সামনের গোরা সার্জেণ্টদের কাছে। তারপর শুরু হল শোভাযাত্রা। সবার আগে চলে মোটর সাইকেল আরোহী কয়েকজন গোরা সার্জেণ্ট, একজনের পিছনে আর একজন। তারপর এক লরী বোঝাই সঙ্গীনধারী রাইফেল উঁচানো গোর্খা সশস্ত্র পুলিশ। প্রিজন্‌ভ্যানের ঠিক সামনে। পিছনেও আর এক লরী বোঝাই গোর্খা পুলিশ। সম্রাটের অতিথি, সুতরাং রাজকীয় বন্দোবস্ত। শোভাযাত্রা সচল হতেই আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "বন্দেমাতরম্‌" "ইনক্লাব জিন্দাবাদ"। পথচারীরা সচকিত হয়। রাজপথের পাশের দুই-একটি বাড়ীর জানালা খুলে যায়। উঁকি দেয় কয়েকটি কৌতূহলী মুখ। এমনিভাবেই এসে পৌঁছাই জাহাজঘাটে, বোধ হয় তক্তাঘাটে।

জাহাজঘাটে আমাদের বিদায় জানাবার জন্য কেউ এসেছে কিনা বোঝারও উপায় নেই। জটলা যা রয়েছে, খাকী পরিহিত পুলিশ ছাড়া সাদা পোষাকে গোয়েন্দা পুলিশ। অনেক দূরে, নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে কিছুসংখ্যক কৌতূহলী মানুষ। রাইফেলধারী আন্দামান মিলিটারী পুলিশ গ্যাংওয়ের উপর দুপাশে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। মাঝখান দিয়ে ডাণ্ডাবেড়ী, আর শিকল বাজিয়ে চলেছি আমরা। জাহাজের ডেক থেকে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামি। বয়লারের চার-

পাশে তিনদিকে মোটা মোটা লম্বা লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা বাঘ-সিংহের খাঁচার মত খাঁচা। একদিকে জাহাজের দেওয়াল। মাঝখানে ছোট্ট পোর্টহোল। কয়েক দিনের মতো এটাই হবে আমাদের বাসস্থান। পাশাপাশি দুটো খাঁচায় আমাদের স্থান হল। ভিতরটা বেশ প্রশস্ত, পাটাতনের উপর কম্বল বিছিয়ে ফরাস করা যাবে। শোয়া-বসা দুটি কাজই চলবে। কিছুক্ষণের মধ্যে দরজা আবার খোলে। দুই দরজার সামনে দুই সান্ত্রী। সান্ত্রীর পিছনে ঢোকে জাহাজের কামার। ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেওয়া হবে। প্রথমবার যে সব বন্দী আন্দামান গিয়েছিলেন, তাঁদের গোটা পথটাই ডাণ্ডাবেড়ী পায়ে যেতে হয়েছিল। পরে জাহাজের ক্যাপ্টেন প্রবল আপত্তি জানায়। মাঝদরিয়ায় যদি তুফান ওঠে, তাহলে বেড়ী পরানো যাত্রী নেওয়ার ঝুঁকি নিতে সে রাজী নয়। সেই থেকে খাঁচায় ঢোকাবার পর বেড়ী খুলে দেবার নিয়ম হয়েছে। শিকল অবশ্য আগেই খুলে দেওয়া হয়েছিল।

তবু সব মিলিয়ে ভালই লাগে। হোক্ না খাঁচা। বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে রয়েছি। দেশের জেলে থাকার সময় দিনের বেশীরভাগ সময় কাটত একা একা সেলে বন্ধ হয়ে। আপন মনে নিজের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া সময় কাটাবার উপায় নেই। জেলের সেই 'সেল' বা খাঁচায় দৃষ্টিও ছিল বন্দী। কয়েক হাত দূরে গিয়ে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসত। মাথার উপরে একফালি আকাশও সবার চোখে পড়ত না। এখানে পোর্টহোলে চোখ রেখে বর্ষায় ভরা গঙ্গার তরঙ্গ উচ্ছ্বাস দেখতে পাই। দেখতে পাই তীরভূমির সবুজ গাছপালা, কুটির, দালান বাড়ী, মানুষজন। চোখ জুড়িয়ে যায়। তারপর সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতায় একটা রোমান্স আছে। গল্পগুজবে কয়েকটা দিন ভালই কেটে যাবে।

স্নান এবং প্রকৃতির তাগিদ মেটানোর সময় সান্ত্রী অন্য সান্ত্রীদের ডাকে। তারা এলে তালা খুলে দুজন দুজন করে নিয়ে যায়। ল্যাভেটরিতে ঠিক বাঘ-সিংহের খাঁচার মত দুর্গন্ধ। স্নান গঙ্গার ঘোলা জলে। সাগরে পড়বার পর থেকে স্নান করতে হবে নোনা জলে। খাওয়ার সময় সকলকে অবশ্য একসঙ্গে নিয়ে যায়। বয়লারের ঠিক ওধারে একটি বড় খাঁচা আছে। সেখানে ২০/২৫ জন দুই লাইনে বসে খাওয়া যায়। খাওয়াটা অবশ্য জেলের তুলনায় ভালই লাগে। রান্নার গুণে কিনা জানি না। অনেকদিন পরে সহকর্মীরা একসঙ্গে খেতে বসেছি, এটাই সম্ভবত ভাললাগার প্রধান কারণ। খাওয়ার পর সবাই একসঙ্গে বসা গেল, অবশ্য দুটো আলাদা খাঁচাতে। পরস্পরকে দেখা, কথা বলা, শোনায় কোনও ব্যবধান নেই। মাঝখানে লম্বা মোটা গরাদের ব্যবধান।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে থাকতে শুনেছিলাম, বন্দীশিবির থেকে সর্ব্বোচ্চ

নেতৃত্ব খবর পাঠিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ হবে আমাদের সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। জেলের জীবনটা সেই বিষয়ে যতটা সম্ভব পড়াশোনার দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে। আন্দামানে সেলুলার জেলের সংবাদও দেশে থাকতে থাকতে পেয়েছি। যে সব দণ্ডিত বন্দীর মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, মুক্তির মাসখানেক আগে তাঁদের দেশের জেলে ফিরিয়ে আনা হয়। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলই হল 'Transit Camp'। মুক্তি মানে অবশ্য দুই-একজন বাদে সবারই বেলায় বিনাবিচারে আটক—'ডেটিনিউ' হিসাবে কোন না কোন বন্দীশিবিরে স্থানান্তর। যারা সেলুলার জেলে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন, তাঁদেরও শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার জন্য ঐ জেলেই নিয়ে যাওয়া হয়।

সেলুলার জেলের জীবনের দুঃসহ অবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের জুলুমের বিরুদ্ধে বন্দীরা ১৯৩৩ সালে মরণপণ অনশন করেছিলেন। তাঁদের দাবীর সমর্থনে আলিপুর জেলের তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীরাও অনশন করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত যে কয়জন ছিলেন 'বম্‌ব্ ইয়াডে'', তাঁরা কি করেছিলেন, আমার মনে নেই। আমরা তখন বিচারাধীন বন্দী। সহানুভূতিসূচক অনশনে যোগ দেওয়ার কথা আমাদের মধ্যেও উঠেছিল। কিন্তু জেল থেকে পলায়নের পরিকল্পনা ছিল বলে নেতারা অন্যরকম সিদ্ধান্ত করেন। অনশন সংগ্রামে জয় লাভের পর সেলুলার জেলের বন্দীরা নিজেদের মধ্যে মেলামেশা, লাইব্রেরী, পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনার বেশ খানিটা সুযোগসুবিধা লাভ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভবিষ্যতের মত ও পথ নিয়ে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে।

বেলা গড়িয়ে এল। গভর্নমেন্টের নির্দেশ আছে আমাদের সকালে বিকালে একঘণ্টা করে উপরে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে হাওয়া খাওয়ার জন্য। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের সহকারী চীফ কমিশনার এই জাহাজেই চলেছেন। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী আই. সি. এস.। বোধহয় বেশীদিন পরাধীন দেশে সিভিলিয়ানি করে রপ্ত হয়ে ওঠেন নি। আমাদের দেখতে এলেন।

গরাদের ফাঁক দিয়েই কথা হল। তবু বলি, ব্যবহার ভদ্র। কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা জানতে চাইলেন। যদি নিয়মের মধ্যে হয়, এবং তাঁর এক্তিয়ার থাকে, তাহলে অসুবিধা দূর করতে সচেষ্ট হবেন। উপরে ডেকে বেড়াতে যেতে পারবো কিনা জেনে কথাটা পাকা করে নিতে চাইলাম। তিনি সান্ত্রীদের প্রধানকে ডেকে নির্দেশ দিলেন। ফলে আর এক বিপত্তি। সকালে বিকালে উপরে নেওয়ার হুকুম তো আছেই বলে সান্ত্রীরা জানে। তবে নতুন করে বলা কেন? তারা ভাবল, আমরা বুঝি নালিশ করেছি। একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে বোঝা গেল। সান্ত্রীদের কাছে

থেকে আমরা কোনও খারাপ ব্যবহার পাই নি। সুতরাং তাদের বুঝিয়ে বলতে হল যে, "আমরা ত' পাকাপাকিভাবে কথাটা জানতে পাই নি, তোমরাও বল নি। তাই জিজ্ঞাসা করেছি মাত্র। নালিশ করি নি।" বিকেলে আমাদের খাঁচার তালা খুলে বাইরে এনে আবার সেই হাতকড়াওয়ালা শিকলের দুধারে জুড়ে দেওয়া হল। তারপর রাইফেলধারী সান্ত্রীদের পাহারায় ছোট্ট কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠি। সাগরসঙ্গম তখনও দূরে। চেয়ে দেখি উপরে নীল আকাশ, নীচে চারিদিকে ঘোলা জলের কুলহারা উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রবল বেগে সাগরের দিকে ছুটে চলেছে। তটরেখা চোখে পড়ে না। কিছুক্ষণ পর পর এক একটা গভীর জঙ্গলে ঢাকা দ্বীপ সেই বাঁধনছেঁড়া জলপ্রবাহের বুকে যেন ভেসে উঠে আবার জাহাজের গতিবেগে পিছনে হারিয়ে যায়। মনে ভাবি, আমরা জাহাজের ডেক থেকে লাফিয়ে জলে পড়ে পালিয়ে যাবো আশঙ্কায় কর্তৃপক্ষের এত সতর্কতার কি প্রয়োজন ছিল? চারিদিকে ভরা বর্ষার গঙ্গার মোহনার যে প্রলয়ঙ্কর রূপ দেখতে পাচ্ছি, এর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবে কে? পৃথিবীর শিশু আমরা। সীমাহীন তরঙ্গভঙ্গের কাছে কত অসহায়। সত্যিই আমরা যে কত অসহায় তা বোঝা তখনও বাকী ছিল।

ঐদিনই সন্ধ্যাবেলায় কিছুটা আভাস পাওয়া গেল। উপরের ডেক থেকে নেমে এসে সবাই কম্বল শয্যায় হাত পা ছড়িয়ে গল্পগুজব করছি। ভিন্ন ভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর কার কি অভিজ্ঞতা হয়েছে, ইত্যাদি। প্রকৃতির তাগিদ মেটাতে বাইরে যেতে হবে। খাঁচার দরজার বাইরে মোতায়েন সান্ত্রীকে বললে সে হাবিলদারকে ডেকে দেবে। চাবি রয়েছে হাবিলদারের কাছে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার অবস্থা। লোহার গরাদ ধরে সামলে নেওয়া গেল। কারণটা বুঝতে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে অনুভব করি জাহাজের নীচেটা প্রবলবেগে দুলছে। প্রকৃতির তাগিদ মেটাবার জায়গা পর্যন্ত যেতে কয়েকবার টাল সামলে গরাদ ধরে ধরে যাওয়া আসা করতে হল। সান্ত্রী জানাল, গঙ্গাসাগরে এসে গিয়েছে জাহাজ। সারারাত এইখানেই নোঙর করে থাকবে। এখান থেকে পাইলটের কাজ শেষ। ক্যাপ্টেন জাহাজের ভার নিয়েছে। কাল সকালে আবার যাত্রা শুরু হবে।"

খেতে যাওয়ার সময় একই অবস্থা। খাওয়ার ব্যবস্থাটা জেলের কয়েদীদের পক্ষে ভালই। ইতিমধ্যেই দুই একজন বন্ধু সমুদ্রপীড়ায় কাহিল। খেতে বসে মণি চৌধুরী সাদের বাগদা চিংড়িটা দিয়েই দিলেন পার্শ্বে উপবিষ্ট দ্বিজেন তলাপাত্রকে। যাকে দিলেন তিনি পরমানন্দে মাছের টুকরোর সদ্ব্যবহার করছেন

দেখে প্রথমোক্ত বন্ধুটির মুখ দিয়ে আক্ষেপ উচ্চারিত হল, "আহা !, আমার বাগদাটা"। বোধ হয় তাঁর অজানিতেই। ফিরে এসে যখন সবাই কম্বলশয্যার উপরে বসে গল্পগুজব করছি, তখন জাহাজের ডাক্তার ভদ্রলোক ঘুরে গেলেন আমরা কেমন আছি দেখতে। তিনি জানালেন, "দি সী ইজ ভেরী রাফ"। (অর্থাৎ সমুদ্র উত্তাল,) "বি কেয়ারফুল" (আপনারা সাবধান হোন)। বন্ধু (দ্বিজেন তলাপাত্র) জিজ্ঞাসা করলেন, "হাউ টু বি কেরাফুল, স্যার ?" (কিভাবে সাবধান হতে হবে, স্যার ?) ডাক্তার ভদ্রলোক সে কথার জবাব না দিয়ে জানিয়ে গেলেন, "আই অ্যাম এ ভেরী গুড সেলার"। (আমি খুব ভাল নাবিক বা সমুদ্রযাত্রী,) মাঝখানে তিনদিন আর ভদ্রলোকের দেখা মেলে নি। চতুর্থ দিন সকালে, জাহাজ যখন প্রায় পোর্টব্লেয়ারের কাছাকাছি পেঁছেছে, সমুদ্র সেখানে প্রায় শান্ত। সেদিন সকালে ডেকে তাঁর সঙ্গে দেখা হল। ঝড়ো কাকের মত চেহারা। পরনে প্রথম রাত্রের সেই নৈশ পোষাক। তিনদিন পোষাক বদলাবার মতো অবস্থা ছিল না। অভিজ্ঞ নাবিকটি করুণভাবে জানালেন, তিনদিন তিনি মাথা তুলতে পারেন নি। তরল খাদ্য গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

প্রথম দিন রাত্রেই কয়েক বন্ধু সমুদ্রপীড়ায় কাহিল হয়ে পড়লেন। জাহাজের মেথর এসে বন্দীদের খাঁচাগুলিতে একটা করে বড়ো ড্রাম দিয়ে গেল, বমি করার জন্য। বন্ধুদের মধ্যে হরিপদ দে এবং অমূল্য সেন বলিষ্ঠদেহী, শক্তিধর বলে পরিচিত। হরিপদবাবু হঠাৎ উঠে ড্রামের কাছে বমি করতে যেতেই তাকে সাহায্য করার জন্য ত্বরিতবেগে উঠে দাঁড়ালেন অমূল্য সেন। সঙ্গে সঙ্গে পা টলে কোন মতে টাল সামলে ড্রামের কাছে গিয়ে বমি করে ফেল্লেন। জিতেন গুপ্ত, নরেন ঘোষও কাহিল। এই কয়দিনে আদৌ কাহিল হননি মাষ্টারমশায়, অর্থাৎ প্রভাত চক্রবর্তী। পরের দিন সকালে ডেকে ভ্রমণে বন্ধুদের সংখ্যা কমে গেল। কয়েকজন কম্বলশয্যা থেকে মাথা তুলতে অপারগ। আমরা কয়েকজন গরাদ আর উপরে ওঠার কাঠের সিঁড়ির রেলিং বেয়ে কোনমতে উপরে গেলাম। জাহাজ সমুদ্রে পড়েছে—অতএব সান্ত্রীদের সতর্কতা আগের তুলনায় শিথিল করা হল। শিকল পরতে হলো না উপরে যাওয়ার সময়। শুধু রাইফেলধারী সান্ত্রীরা সঙ্গে রইল, ডেকে উঠে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়ের আকারের অতিকায় ঢেউগুলি যেন ক্ষ্যাপা আক্রোশে উত্তরের দিকে ছুটে চলেছে। কি ভয়ঙ্কর রুদ্র রূপ, অথচ কি সুন্দর, কি বিরাট, 'অনন্ত', 'অসীম', 'বিরাট' প্রভৃতি যে সব শব্দ এতদিন শুনে এবং ব্যবহার করে এসেছি, সেগুলি যেন প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। কোন বিশেষণই তাকে প্রকাশ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

উপরে নীল আকাশ, সীমাহীন তার বিস্তার। নীচে সীমাহীন উদ্বেল, উত্তাল তরঙ্গের দল। দিগন্তরেখা মুছে গিয়েছে। এক একটি অতিকায় ঢেউ ছুটে এসে জাহাজটাকে যেন উপরের দিকে ছুঁড়ে দেয়। সেই ঢেউটি চলে যেতে না যেতে ছুটে আসছে অমনি বিশাল আর এক ঢেউ। দ্বিতীয়টি এসে পৌঁছবার আগে আমাদের জাহাজটি যেন শূন্য থেকে আছড়ে পড়ে আগাগোড়া কেঁপে ওঠে। পরমুহূর্তে আবার নতুন আগন্তুকের ঠেলায় উপরের দিকে লাফিয়ে উঠতে হয়। কত ছোট মনে হয় জাহাজটিকে, আর পৃথিবীর শিশু আমরা কত অসহায়। যাত্রা করার আগের দিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের বমব্ ইয়ার্ডে এক সহবন্দী আমাদের জন্য আয়োজিত বিদায় সভায় গান গেয়েছিলেন, "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে আমি ডুবতে রাজী আছি।……আমি তুফান পেলে বাঁচি।"—গানের কলিগুলি স্মরণ করে মনে মনে কবিগুরুর উদ্দেশ্যে বলি, "সাগরের তীরে বসে এ গান ভালই লাগে বটে। কিন্তু মহাপ্রলয়ের নেশায় উন্মত্ত বঙ্গোপসাগরের বুকে ভাসমান অবস্থায় এ গান কি তুমি রচনা করতে?" ডেকের উপরেই বমি করে ফেলি।

আমাদের খাঁচার বিপরীত দিকে বয়লারের ডানপাশের খাঁচায় স্থান পেয়েছে ভূমিকায় পাঠান কয়েদীর দল। গতকাল একটুক্ষণ বার্তাবিনিময় হয়েছিল। কি মোকদ্দমায় তাদের সাজা হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে একজন জবাব দিল "কৎল", অর্থাৎ খুন। আমাদের কোন্ কেস্ জানতে চাওয়ায় উত্তর দিলাম, 'বমব্ কেস।' ওদের চোখে মুখে লক্ষ্য করলাম, শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠেছে। কিন্তু সেইসব তাগড়া জোয়ান পাঠানরাও সমুদ্রের দোলানির ঠেলায় শয্যাশায়ী। বমি ঠেকাবার জন্য কর্তৃপক্ষ থেকে আমাদের কয়েকটুকরো লেবু দিয়েছিল। পাঠানদের দুই-একজন সকাতরে অনুরোধ জানায়, দু-এক টুকরো তাদের দিতে পারি কিনা। সহবন্দী না হলেও নির্বাসনের যাত্রায় সহযাত্রী ত' বটেই। খুশিমনেই অনুরোধ রক্ষা করলাম।

পরের দিন অবিশ্রান্তভাবে চলে সমুদ্রের সেই তাণ্ডব। যেন সংহারলীলায় মেতে উঠেছে বিক্ষুব্ধ জলধি। তবু দুবেলা ডেকে যাওয়ার লোভ সামলাতে পারি না। ডেকের উপরে বসে সামনের দিকে দূর দিগন্তের অস্পষ্ট রেখার দিকে চেয়ে চেয়ে "মহারাজা"কে মনে হয় যেন একটা খেলনা, লিখতে ভুলে গিয়েছি আমাদের জাহাজের নাম, "মহারাজা"। সেই যুগে ঐটিই ছিল ভারতের মূল ভূখণ্ড এবং পোর্টব্লেয়ারের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র উপায়। দু-চোখ ভরে দেখি সেই প্রমত্ত রুদ্ররূপ। দানবের সঙ্গে তুলনা করলে একে ছোট করাই হয়, যেমনটি হয় আকাশকে গোষ্পদের সঙ্গে তুলনা করলে। এখন আর, "তুফান পেলেই বাঁচি"—

নয়, মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়, কবিগুরুর অন্য একটি কবিতার কয়েকটি ছত্র—
"চেতনা সিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জনে নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুক্ত অট্টহাস্যসনে অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরলরোলে উঠিতেছে রণি রণি—ছায়া রৌদ্র সে দোলায় দোলে অশ্রান্ত উল্লোলে"। তবে চেতনায় নয়, চর্মচক্ষে দেখছি যে সিন্ধুকে তার মধ্যে যেন নটরাজের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করি।

চতুর্থ দিন সকালে ঘুম ভাঙতে বোঝা গেল, সাগর অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। জাহাজের দোলানি আছে, তবে অত প্রবল নয়। পোর্ট হোলের ফোকর দিয়ে চোখে পড়ে দূর দিগন্তে মাঝে মাঝে এক একটি পর্বতের রেখা। সবাই বলাবলি করি, এখানে কোন্ পাহাড়ের শ্রেণী? তবে কি পূর্বঘাট পর্বতমালা? তাই বা কি করে হয়? সে ত' অনেক দূরে। ডেকে যাওয়ার সময় সান্ত্রীদের জিজ্ঞাসা করতে জানা গেল, 'মহারাজা' বঙ্গোপসাগর ছেড়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আন্দামান দরিয়ার প্রবেশ করেছে! ঐ সব পাহাড় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভুক্ত। সেই জন্য সমুদ্র শান্ত। ডেকে যাওয়ার সময় আবার দুদিন পরে হাতকড়া লাগানো শিকলে এক একজন হাত ঢুকিয়ে বন্দীর অলঙ্কারে সজ্জিত হলাম। আমরা কি বৃটিশ গভর্নমেণ্টের চোখে এতই সাংঘাতিক! সাগরের অপেক্ষাকৃত শান্ত তরঙ্গরাশির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে পালাবার চেষ্টা করবো? দূর দিগন্তে মাঝে মাঝে গভীর বনে ঢাকা এক একটি দ্বীপ ভেসে উঠলেও কূলহারা জলরাশির দিকে তাকিয়ে কল্পনাও করতে পারি না, ছাড়া পেলেই তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বো। ডেক থেকে খাঁচায় ফিরে আসার বোধ হয় ঘণ্টা কয়েক পরে জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে এসে পেঁছালো। দৈনন্দিন আবশ্যিক কর্তব্য এবং মধ্যাহ্ন-ভোজন ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। জাহাজ নোঙর করে 'চ্যাথাম' দ্বীপের জেটিতে। 'ফোনিক্স বে' সেখানে দ্বীপপুঞ্জের দুটি প্রায় সমান্তরাল বাহুর মধ্যে খাঁড়ির আকারে প্রবেশ করেছে। তিনদিক পাহাড়ে ঘেরা প্রাকৃতিক বন্দর এটি। তার মাঝে ছোট্ট একটি দ্বীপ চ্যাথাম। এসব দেখেছি পরে। জাহাজের পোর্টহোলের ভিতর দিয়ে চোখে প'ড়ে সবুজ তমাল, তাল, নারিকেল বনরাজি নীলা একটি পাহাড় সাগরের বুক থেকে আকাশের দিকে মাথা তুলেছে। উচ্চতা অনুমান হয়, দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রেণীর নীচের অংশে অবস্থিত রংটং, বা চুনভাট্টির মত। সাগরের এক একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তার পাষাণতটে আছড়ে প'ড়ে শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে আবার ফিরে আসছে। কতকাল ধরে চলেছে এমনি খেলা, কে জানে? সাগরের বুকের দ্বীপগুলির কথা ইংরাজী উপন্যাসে পড়েছিলাম বটে। চাক্ষুষ দেখার আগে ধারণা ছিল না। এ যেন পর্বত, আর সমুদ্রের একত্র অবস্থান। এক

সময়ে আফ্রিকা থেকে শুরু করে দাক্ষিণাত্য হয়ে পূর্বে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত এক মহাদেশের অস্তিত্ব ছিল। ভূকম্পণের আলোড়নে তার অনেক অংশ জলধির অতল জলের নীচে ডুবে গিয়েছে। এইসব দ্বীপ সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। আশৈশব হিমালয়ের কোলে মানুষ আমি। এখানে এসে আবার পাহাড়ের দেখা পাবো, সে কথা ভাবি নি। সাগর, আর পাহাড়ের মিলন মনে আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। হোক্ না হাত-পা লোহার শিকলে বাঁধা, মন তো বন্দী নয়। ঐ ছোট্ট ফোকরটুকুর মধ্য দিয়েই প্রকৃতির অপরূপ রূপ যতটুকু পারি দুচোখ ভরে দেখে নিই। সেলুলার জেলের অন্ধকুঠুরী থেকে এ দৃশ্য দেখার সুযোগ পাবো কিনা কে জানে। জাহাজ থেমেছে বুঝি, ইঞ্জিনের শব্দ কানে আসে না বলে। নানাধরণের কর্মব্যস্ততার আওয়াজ শুনি। শেষ পর্যন্ত খাঁচার দরজা খোলে। সান্ত্রীদের পাহারায় কামারেরা এসে সবার পায়ে বেড়ী পরিয়ে যায়। বেড়ী পরার পালা শেষ হলে সেই হাতকড়াওয়ালা লোহার শেকলের দুধারে লাইন করে দাঁড়াতে হয়। জাহাজের গায়ে ঝোলানো দড়ির মই, দুপাশে দড়ির রেলিং পা ফস্কালে লোনা জলে নাকানি চোবানি খেতে হবে সবাইকে। বেড়ী পরা পায়ে সন্তর্পণে নামি। সান্ত্রীরা অবশ্য সাহায্য করে। মই থেকে সোজা লঞ্চে। লঞ্চ নিয়ে যাবে সেলুলার জেলের জেটিতে।

লঞ্চে 'ফোনিক্স বে' ধরে উত্তরের দিকে এগোতে ডানদিকে অ্যাবারডীন দ্বীপ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম। যে জেটিতে আমরা যাবো, তার নাম অ্যাবারডীন জেটি। বাঁ পাশে একটি দ্বীপ। আয়তনে অ্যাবারডীনের চেয়ে ছোট হলেও ঘর-বাড়ীগুলি সাজানো গোছানো। সান্ত্রীদের কাছে জানা গেল ওটির নাম 'রস আইল্যান্ড', চীফ কমিশনারের সদর দপ্তর, প্রশাসনিক প্রধান কার্যালয়। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থান ঐ দ্বীপে। ওখানেই হাসপাতাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই জেটিতে পৌঁছে গেলাম। তারপর প্রিজ্নভ্যানে সেলুলার জেলের গেট। আশেপাশে কি আছে না আছে দেখার সুযোগ হয় নি। জেলগেটের ভিতরে ঢোকার পর সকলের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে দেওয়া হল। হাত আগেই শৃঙ্খলমুক্ত হয়েছে। মূল ভূখণ্ডের জেলে নতুন কয়েদি এলে যে সব নিয়মকানুন কড়াকড়ি ভাবে মানা হয়ে থাকে, এখানে তা অনেক পরিমাণে শিথিল দেখা গেল। জেলের ভিতরে ঢোকার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল এক নম্বর ওয়ার্ডে, ওটা "কোয়ারান্টাইন" ওয়ার্ড, অর্থাৎ সাগরের ওপার থেকে কয়েদীরা এলে দশদিন পর্যন্ত তাদের আলাদা করে রাখা হয়, ওপারের কোন রোগের বীজানু সঙ্গে এসেছে কিনা পরীক্ষার জন্য। (৩) আমাদের স্থান হল দোতলার 'সেল' গুলিতে।

বাংলার জেলের 'সেল' গুলিও আসলে খাঁচাই। তিনদিকে দেয়াল, সামনে লোহার গরাদে বসানো ভারী দরজা। সামনের দেয়ালের একদিকে দরজায় তালা লাগাবার ব্যবস্থা। পিছনের দেয়ালে নাগালের বাইরে লোহার গরাদে বসানো 'ভেন্টিলেটর।' ঘুলঘুলি বললে অন্যায় হবেনা। এখানকার সেলের একটি বৈশিষ্ট্য প্রথমেই চোখে পড়ে, লোহার গরাদে বসানো দরজাটি ঠিক মাঝখানে না হয়ে একপাশে, বাংলার জেলের সেলের দরজার চেয়ে অনেকখানি ছোট। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দু-দিকেই। দীর্ঘদেহী, হৃষ্টপুষ্ট লোক হলে সরাসরি ঢোকার বদলে মাথা ঝুঁকিয়ে কাৎ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। বাংলার জেলে সেলগুলির দরজায় তালা পড়লেও সামনেটা দৃষ্টি অবারিত থাকত। অবশ্য ওয়ার্ডের দেওয়াল পর্যন্ত।

আকাশের এক টুকরো চোখে পড়ত। কিন্তু এখানে দরজায় তালা পড়লে মনে হয়, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রইল না। প্রায় অন্ধকূপে বন্দী হওয়ার মত অবস্থা। সেলগুলির সামনের বারান্দা লোহার গরাদে ঘেরা, দুদিকের প্রবেশ পথে সেই গরাদের বেড়ার গায়ে দুটি ছোট দরজা। আমাদের অবশ্য তখনই সেলে বন্ধ হতে হল না। আমাদের বন্ধুরা ১৯৩৩ সালের অনশন সংগ্রামের পর থেকে ছোটখাটো নানা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দী-দের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের আচরণ এখন অনেক সংযত, খানিকটা ভদ্র হয়ে এসেছে।

এক নম্বর (কোয়ারাণ্টাইন) ওয়ার্ডেই খানিকটা প্রশস্ত মাঠ আছে। দেওয়ালের ওপারে পাহাড়ের খানিকটা অংশ দেখা যায়। একপাশে স্নানের জন্য 'হাওদা', বা লম্বা চৌবাচ্চা, এবং আর একপাশে তিন চারটি পায়খানা, টিন দিয়ে তিনদিক ঘেরা, সেগুলির সামনে হাত দুই ব্যবধানে লম্বা টিনের বেড়া, আমরা যখন পৌঁছেছি, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের ফুটবল খেলার জন্য ঐ মাঠটি নির্দিষ্ট হয়েছে। দশদিন অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে আমাদের মেলামেশা বারণ। খেলা শেষে তাঁরা নিজ নিজ ওয়ার্ডে ফিরে গেলে আমাদের বারান্দার তালা খুলে নীচে নামতে, স্নান ও প্রকৃতির তাগিদে সাড়া দিতে সময় দেওয়া হবে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে খেলা দেখি। যাঁরা পূর্ব পরিচিত, তাঁরা নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলেন। যখন নীচে নামার অনুমতি পাওয়া গেল, তখন সন্ধ্যার আঁধার নামতে শুরু করেছে। বাংলার জেলে এ সময় সেলের বাইরে থাকাটা ছিল কল্পনার অতীত।

চারদিকে দেওয়ালের ঘেরা হলেও ওয়ার্ডের মাঠে নেমে হাওদায় স্নান করে আমি অন্ততঃ মনে বেশ আনন্দই অনুভব করি। শুনেছি প্রথম প্রথম রাজনৈতিক বন্দীদের যে দলগুলি সেলুলার জেলে এসেছেন তাঁদের মনের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ

ভিন্ন। দেশের মাটি ছেড়ে যেতে হচ্ছে সুদূর এক দ্বীপের নির্বাসনে, কতদিনের জন্য, কে জানে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় রাজনৈতিক বন্দীদের যে দলগুলি এখানে এসেছিলেন, তাঁদের স্মৃতিকথায় সেলুলার জেলের যে চিত্র পেয়েছি, তা ছিল দস্তুর মতো বিভীষিকা। এবারকার পর্বে আমাদের পূর্বসূরী হয়ে যাঁরা এসেছেন, তারা সেই বিভীষিকাকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অসম সংগ্রামে নেমেছেন জীবনপণ করে। তিনজনের আত্মদানের বিনিময়ে দুঃসহ অবস্থাকে অনেকটাই বদলাতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু তিন শহীদের প্রাণের বিনিময়ে বললে ঠিক হবে না। ১৯১৫-১৯২১ সালের তুলনায় দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত আবহাওয়া অনশনবন্দীদের জয়লাভে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে দেশের জেলে তখন (১৯৩৩-১৯৩৬) যা অবস্থা চলেছে, মাতৃভূমির কোলে থেকেও বাইরের জগত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে যে নিম্নতম সুযোগগুলি সমস্ত সভ্যদেশে দেওয়া হয়ে থাকে, তা থেকে বঞ্চিত। স্বভাবতঃই এখানে এসে বন্ধনের মধ্যেও যেন খানিকটা মুক্তির স্বাদ পাই। স্নান সেরে এসে সান্ধ্য-ভোজন। দেশের জেলে সূর্যাস্তের আগেই খেয়ে নেওয়া ছিল বাধ্যতামূলক, ক্ষিধে পাক বা না পাক। এখানে গরাদে ঘেরা বারান্দায় কম্বল পেতে সারি দিয়ে খেতে বসেছি। 'কিচেন' পরিচালনার ভার আমাদের বন্ধুরা আদায় করেছেন। তাঁদের সাহায্যকারী হিসেবে কর্তৃপক্ষ কয়েকজন সাধারণ কয়েদী নিযুক্ত করে। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ আছে—পাঠান, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী, তামিল ও তেলেগুভাষী। তখন বর্মা ছিল বৃটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত। বর্মী কয়েদী রয়েছে বেশ কিছুসংখ্যক। সাধারণ কয়েদীদের রাখা হয় রাজনৈতিক বন্দীদের থেকে পৃথকভাবে অন্যান্য ওয়ার্ডে। তারা 'T. I.' অর্থাৎ "Temporarily Incarcerated" নামে অভিহিত। তিনমাস সেলুলার জেলে বন্দী থাকার পর বাইরে দ্বীপের বিভিন্ন অংশে ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দিনের বেলায় জঙ্গল কাটে, রাস্তা বানায়, পাথর ভাঙে। রাত্রে শিবিরে এসে থাকে। এক বছর পর এক একটি নির্দিষ্ট এলাকায় খানিকটা স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ দেওয়া হয়। বিভিন্ন পেশায় কাজ করার লাইসেন্স দেওয়া হয়। কাজের জন্য বেতন পায়। শান্তশিষ্ট স্বভাবের কয়েদীরূপে পরিচিত হলে স্বদেশ থেকে স্ত্রীপুত্রকে আনিয়ে এক সঙ্গে বসবাস করার অধিকারও পায়। এই রকম কয়েদীদের মধ্য থেকেই এই উপনিবেশে যোগ্যতা অনুসারে কেরাণী, ডাক্তার ও কম্পাউন্ডার, হিসাবরক্ষক, বনকাটা এবং রাস্তা বানাবার কাজে নিযুক্ত কয়েদীদের পরিদর্শক ইত্যাদি নিযুক্ত হয়ে থাকে। একদা ঘন জঙ্গলে ঢাকা, আদিম উপজাতি-

দের বাসস্থান এই সব দ্বীপগুলিকে উপনিবেশ হিসাবে গড়ে তোলা, তথা এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেন্ট উপরোক্ত নীতি অনুসরণ করে।

আমরা হলাম "P. I." অর্থাৎ "Permanently Incarcerated"। যতদিন থাকতে হবে, সেলুলার জেলের চার দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যেই কাটবে। চলা-ফেরা, মেলামেশার যেটুকু স্বাধীনতা ঐ চার দেওয়ালের ঘেরা দুনিয়ার মধ্যেই। আমাদের নিজস্ব নামগুলি জেলের খাতায় লেখা থাকলেও আমাদের পরিচয় হবে এক একটি সংখ্যা হিসাবে। P. I. অমুক ইত্যাদি। আমার নম্বর হল, P I. 369.।

খাওয়া শেষ হওয়ার পর 'সেলে' বন্ধ হওয়ার পালা। অল্প ক্ষমতার একটি বৈদ্যুতিক বাতি অবশ্য রয়েছে সেলের ভিতরে। রাত দশটা পর্যন্ত থাকবে, তার-পর নিভিয়ে দেওয়া হবে। সামনের বারান্দায় অবশ্য কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বেশী ক্ষমতার বাতি সারারাত ধরে জ্বলবে। 'করিডর', বা বারান্দার দুপাশের দরজা গুলিতেও তালা পড়বে। সেলের ভিতরে রাত্রে প্রকৃতির তাগিদ মেটাবার জন্য এককোণে রাখা আছে আলকাতরা মাখানো টিনের 'টুকরি'। এটি অবশ্য দেশের জেলেও রাত্রির নিত্যসঙ্গী ছিল। অনেক সময় দিনেও। তবে এখানকার 'টুকরি'র আকারটা বেয়াড়া ধরনের। যতটা কানা উঁচু, ততটা চওড়া নয়। প্রকৃতির 'বড়' ও 'ছোট' তাগিদ এক সঙ্গে হলে অভ্যাসের দরুন দেহনিঃসৃত দুর্গন্ধ জল সেলের মেঝে ভাসিয়ে দেবে।

জেলখানায় মেথরের কাজ করে কয়েদীরাই। তাদের তৃতীয় শ্রেণীর অন্য বন্দীদের তুলনায় দু একটা বিষয়ে একটু বেশী সুবিধা দেওয়া হত; যথা ধূম-পানের অধিকার। তবে সীমিতভাবে। মেথরের কাজ করতে সহজে বড় একটা কেউ রাজী হত না বলে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নানারকম উৎপীড়ন করে ও লোভ দেখিয়ে রাজী করানো হত। বাংলার জেলের পরিভাষায় কয়েদী মেথরকে বলা হত 'হাড়ি'। এখানে দেখা গেল, বর্মী কয়েদীদের মধ্য থেকে মেথরের কাজকর্ম করানো হয়। একজন বর্মী কয়েদী এসে সেলগুলিতে 'টুকরি' বসিয়ে দিয়ে গেল। দ্বিজেন তলাপাত্র একটু খুঁতখুঁতে। তার ঐ টুকরিটির কোনও ত্রুটি চোখে পড়ায় বর্মীকে বলতে গিয়ে মহা ফ্যাসাদ। বর্মী কথা বোঝে না। তার কথা আমরা বুঝি না। এটুকু বোঝা গেল, সে খুব রাগী মেজাজের। আপন মনে দুর্বোধ্য ভাষায় বকতে বকতে চলে গেল। ব্যাপারটির পরিসমাপ্তি কৌতুকান্ত। দ্বিজেন-বাবু ওয়ার্ডের পাঞ্জাবী সান্ত্রীকে এ বিষয়ে বোঝাতে গিয়ে নাজেহাল। সান্ত্রী

'হাড়ি' শুনে জবাব দেয়, "কে'ও! আপকে সেলমে লোটা নেহি দিয়া ?" দ্বিজেনবাবু আর একবার চেষ্টা করেন, "মেস্তর"কে ডাকতে হবে। সান্ত্রী বলে, "মিস্ত্রী! মিস্ত্রী কেয়া করেগা ?" নিরুপায় দ্বিজেনবাবু শেষে ঈশারা ইংগিতের আশ্রয় নিলেন। শেষ পর্যন্ত সান্ত্রী তাঁর বক্তব্য হৃদয়ংগম করতে পেরে বলে ওঠে, "ও:! পাংগী।" বোঝা গেল, সেলুলার জেলের পরিভাষায় মেথর হল, "ভাঙ্গী"। পাঞ্জাবী উচ্চারণে 'ভ' শোনাচ্ছে 'প'এর মত। যাহোক্, সুরাহা তো হল। আমাদের মধ্যে এক ধীরেন ভট্টাচার্য ছাড়া আর কেউ বাংলার বাইরে যায়নি। ভাংগা ভাংগা হিন্দী যা আমাদের আয়ত্ত হয়েছে বাংলার জেলে বিহারী ও উত্তরপ্রদেশের সান্ত্রীদের সংগে কথাবার্তায়। তারা আবার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে "দেহাতী" বুলি ব্যবহার করে। এখানে প্রথম দিন থেকেই আমাদের জানা শব্দভাণ্ডারে নতুন সংযোজন হতে লাগলো। খাবার পরিবেশনের তদারক করতে এসেছেন একজন বন্দী বন্ধু। পরিবেশন যারা করছে তারা হিন্দুস্থানী। প্রথমবারের পর দ্বিতীয়বার ভাত চাওয়াতে তদারককারী বন্ধু ডেকে বলেন, "বলদেও। চাউল লে আও।" আমরা প্রথমে একটু অবাক। পরে 'চাউলের' ব্যাগ টেনে নিয়ে বলদেও যখন দ্বিতীয়বার ভাত পরিবেশন করে, তখন বোঝা গেল, ভাতের নামই "চাউল"।

সেলে বন্ধ হওয়ার পর ঘুম আসে না অনেকক্ষণ। জাহাজ থেকে নেমেছি বেশ কয়েক ঘণ্টা হয়ে গিয়েছে। তবু গত তিনদিন ধরে প্রতিমুহূর্তে শোনা সেই অবিশ্রান্ত গর্জনের প্রতিধ্বনি এখনও কানে বাজে। শোঁ শোঁ আওয়াজ একটানা কানে শুনি। সমুদ্রের ঢেউগুলো জোয়ারের সময় দ্বীপের পাষাণ তটমূলে প্রবলবেগে আছড়ে পড়ছে। সে আওয়াজও ঐ সংগে মিশে যায়। উঠে দরজা ধরে দাঁড়াই। বাংলার জেলে অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম না নামলে দরজার গরাদ ধরে তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে থেকেছি। এখানে ছোট দরজাটুকুর এপারে দাঁড়িয়ে আকাশের খুব ছোট টুকরো চোখে পড়ে। ভাবি দশদিন পরে যখন ভিতরে যাবো, তখন কি এই রকমই হবে ? কখন যে ঘুমিয়ে পড়ি টের পাই না।

সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য ওয়ার্ডের প্রাংগণে নামার সুযোগ পাওয়া গেল। দেওয়ালের ঠিক ওপারে পাহাড়ের খানিকটা দেখা যায়। কোন্‌টা পুব, কোন্‌টা পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ ঠাওর করতে পারি না। এখানে এসে যেন দিক্‌বিভ্রম হয়ে গিয়েছে। নীচে নামতে একজনের সংগে দেখা হল। রাজনৈতিক বন্দী, মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। তবে পুরোপুরি নয়। হাওদা থেকে মগে জল নিয়ে নিজের আঙুল চিরে রক্তের ফোঁটা মিশিয়ে প্রাঙ্গণের এককোণে অবস্থিত ফুলগাছগুলির উপর ছিটিয়ে দিচ্ছে। অন্য কোনও অস্বাভাবিকতা নেই। পরে জানা

গেল, বন্দীটির নাম বাচ্চুলাল, উটাকামণ্ড ব্যাংকলুটের মামলায় দণ্ডিত। তাহলে ত' আমাদের স্বগোত্র। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলাটির সংগে এই ঘটনাটিও সংশ্লিষ্ট। বাচ্চুলাল যে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতনে অর্ধোন্মাদ হয়েছে, তা বলা ঠিক হবে না। তবে নির্বাসিত জীবনের রুক্ষ কঠোর পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে গিয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে। সেলুলার জেলের ইতিহাসের শেষপর্বে এই ধরনের মানসিক বিকৃতির শিকার আরো কয়েকজন বিপ্লবীকে হতে হয়েছে।

দেশ থেকে যে অনেক দূরে চলে এসেছি, সে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে পরের দিনের একটি ছোট্ট ঘটনায়। জেল হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য সবাইকে ডাকা হয়েছে। ডাক্তার দুজন প্রাক্তন কয়েদী, এখন সরকারী বেতনভোগী কর্মচারী। একজনের নাম সঙ্গত রায়, অপরজনের শিউকুমার, বা ঐ ধরনের কিছু। আমাদের মধ্যে একজন তাঁর রক্তচাপ পরীক্ষার কথায় ডাক্তার ভদ্রলোক জানালেন, রক্তচাপ মাপার যন্ত্রটি মেরামতের জন্য 'ইণ্ডিয়া'তে পাঠানো হয়েছে। সেটি ফিরে এলেই আপনাকে পরীক্ষা করা হবে। কতদিন নাগাদ আসতে পারে জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, দু-তিন মাস ত' বটেই। তখন মূল ভূখণ্ডের সংগে পোর্টব্লেয়ারের যোগাযোগের উপায় ছিল, সবেধন নীলমণি 'মহারাজা' জাহাজ। সেটি কলকাতা থেকে পোর্টব্লেয়ার হয়ে যেত প্রথমে রেঙ্গুনে, সেখান থেকে মাদ্রাজে, তারপর কলকাতায়। আমাদের মত P. I. দের পক্ষে ত' বটেই, দ্বীপের সকল অধিবাসীর কাছে তাই জাহাজ আসাটা ছিল একটি বিশেষ ঘটনা। চিঠিপত্র থেকে শুরু করে অনেক নিত্যব্যবহার্য জিনিষও আসত জাহাজে। কুমড়ো, আলু, পেঁয়াজ প্রভৃতি তরকারী মূল ভূখণ্ড থেকে চালান হয়ে আসত। এখানে পাওয়া যেত ফলের মধ্যে পেঁপে ও কলা। দ্বীপের সমুদ্রের সন্নিকটবর্তী অংশ নারিকেলবনরাজিনীলায় ঢাকা হলেও ডাব বা নারিকেল ফল হিসাবে ব্যবহৃত হত না। শুকিয়ে ছোবড়া করে দড়ি, এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য জিনিষ তৈরীই ছিল নারিকেল ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক বন্দীদের কাজ দেওয়া হত ছোবড়া পিটিয়ে নরম করে দড়ি বানানো। দুধ বলতে মোষের দুধ।

"কোয়ারাণ্টাইন" ওয়ার্ডে থাকাকালে ভিতরের দু-একজন বন্ধু দেখা করতে আসতেন। যাঁরা 'কিচেন' পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের দুই-একজনকে জেল কর্তৃপক্ষ আসার অনুমতি দিয়েছিল। যাঁরা দেখা করতে আসতেন, তাঁরা ঐ সুযোগ কাজে লাগাতেন। অমলেন্দু বাগচি অনুশীলন সমিতির একজন দায়িত্ব-শীল কর্মী ছিলেন। রাজশাহী শহরের বাসিন্দা। আমি যখন রাজশাহী কলেজে

পাড়ি, তখন থেকে পরিচয়। ১৯৩০ সালে সাময়িকভাবে আত্মগোপন করে থাকার সময় তাঁর বাসাতে থেকেছি। তিনি রাজশাহী ষ্টেশনের কাছে ডাক লুঠের মামলায় সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। সেলুলার জেলে এই দ্বিতীয় পর্বে যে সব বিপ্লবী দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডিত বন্দীকে পাঠানো হয়, তিনি ছিলেন তাদের প্রথম দলে। সুতরাং ১৯৩৩ সালের অনশন সংগ্রামের পূর্বে রাজনৈতিক বন্দীরা, বিশেষতঃ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীরা কি রকম নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছেন, তার তিনি ভুক্তভোগী। প্রথম দিনের কথাবার্তায় সামান্যমাত্র আভাষ পাওয়া গেল। পরে ধীরে ধীরে সব কথাই জানতে পেরেছি। জেলের ভিতরে যাওয়ার পর সে সব বিবরণ যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করেছি।

কোয়ারাণ্টাইনের মেয়াদ শেষ হল। সেইসময় সেলুলার জেলের ছিল সাতটি তিনতলা ব্লক। মাঝখানে চারতলা 'সেণ্ট্রাল টাওয়ার', উপরের তালাটি খোলা। মাঝখানে শুধু 'Sentry box', সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে diagonal ভাবে সাতটি বাহু প্রসারিত। তিনতলা ও দোতলা প্রত্যেকটি ব্লকের সঙ্গে যুক্ত। নীচের তলায় টাওয়ারের চারপাশে সিমেণ্ট বাঁধানো আঙ্গিনা। এক ব্লক থেকে অন্য ব্লকে যেতে হলে গরাদে ঘেরা লম্বা বারান্দার শেষে অবস্থিত গরাদ দেওয়া দরজা দিয়ে বের হয়ে আঙ্গিনা দিয়ে ঘুরে অন্য ব্লকে প্রবেশের ব্যবস্থা। প্রত্যেকটি পথের প্রবেশ-পথে সান্ত্রী। আমরা যখন দিনের বেলায় গিয়েছি তখন দিনের বেলায় দরজায় তালা লাগানো থাকত না বটে, তবে সান্ত্রী গেট খুলে দিলে, তবে বের হওয়া এবং অন্য ব্লকে প্রবেশ। আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। তাঁদের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হল ছয় নম্বর ব্লকের একতলায়, আর আমি, প্রভাত মিত্র, ধীরেণ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র চৌধুরী, এবং জ্যোতিষ মজুমদার গেলাম দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট পাঁচ নম্বর ব্লকে।

প্রত্যেক ওয়ার্ডের মুখে তিনটি গেট, একটি সেণ্ট্রাল টাওয়ার থেকে ওয়ার্ডে ঢোকার। ঢোকার পর পাশের গেটটি ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণে যাওয়ার, এবং সামনেরটি সেলগুলির সামনে লম্বা করিডরে প্রবেশের। রাতে তিনটিতেই তালা পড়ে। একটা অতিকায় খাঁচা। এখানে কয়েদীদের পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। যাবে কোথায়? জেলের প্রাচীরের বাইরে যদিও বা কেউ যায়, পানীয় জলের জন্য লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। বৃষ্টির জল কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গায় বড় বড় ট্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা হয়। তাই পরিশ্রুত করে পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। শুনেছি একটি ঝরণা ছিল, সেটির জল শুধু উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। বনে লুকিয়ে থাকার উপায় নেই। গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলে

আদিম উপজাতির লোকদের বিষাক্ত তীরে মৃত্যু সুনিশ্চিত। পলাতক তৃষ্ণায় কাতর হয়ে জলের ট্যাংকগুলির কাছে আসতে বাধ্য হবেই। জেল পলায়নের কোনও ঘটনা শোনা যায় নি। বাইরের শিবির থেকে কখনও কখনও কেউ পালিয়ে দু-তিনদিন পরে হয় ধরা পড়েছে, নতুবা ধরা দিয়েছে। দেখে শুনে মনে হয়, তালা এই জেলে নিরর্থক। তবু, জেলখানা যখন, তালা বন্ধ হতে হবেই। প্রত্যেকের সেলের তালা ধরে হিসেব মতো চারটি তালার আড়ালে বন্দীরা সুরক্ষিত।

ছয় নম্বর ওয়ার্ডের প্রাঙ্গন বেশ বড়। ঠিক মাঝখানে একটি টিনের শেড। সেটিতে বসে খাওয়া হয়। শেডের একপাশে হাতের কাজ, যথা তাঁত, ছুতোরের কাজ, ইত্যাদি শেখার ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাটা শুনেছি ১৯৩৩ সালের অনশন সংগ্রামের পরে হয়েছে। শেডের দুপাশ দিয়ে দুটি পথ প্রধান প্রাচীরের সীমা পর্যন্ত প্রসারিত। পথের দু-ধারে ঘাসে ঢাকা লন, মাঝে মাঝে দু-একটা ফুলের গাছ। হাস্নুহানার ঝাড় রয়েছে একটি। প্রথমটা দেখে মনে হয় বেশ ভাল জায়গাই ত।' যারা ১৯৩৩ সালের অনশন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ইতিমধ্যেই শোনা হয়ে গিয়েছে। তাই এখনকার ভাল অবস্থা সৃষ্টির আগে কিরকম ছিল অনুমান করা কঠিন হয় না। বন্ধুদের 'খাটুনী', অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের যে সব কাজ করতে দেওয়া হয়, তা করতে হত ঐ তালাবন্ধ করিডরে বসে। প্রাঙ্গনে বার হওয়ার সুযোগ পেতেন শুধু স্নানের সময়। সেলগুলিতে ঢুকে দেখি, দিনের বেলাতেও অন্ধকার বিশেষতঃ একতলার সেলগুলিতে। রাজনৈতিক বন্দীদের দু-চার জন করে ছড়িয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে রাখা হত। তাদের স্থান হত একতলায়। দোতলা, তেতলার করিডর থেকে সমুদ্র দেখা যায়। একতলায় শুধু গর্জনটাই কানে আসে, দৃষ্টি প্রধান প্রাচীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

সেলগুলির ভিতরে শোয়ার জন্য হাত-দুই চওড়া, মানুষ সমান লম্বা পুরু তক্তা। তক্তার দুই দিকে হাত দেড়েক উঁচু, আধ হাত পুরু, দু-হাত চওড়া দুটি পায়া লাগানো। দুখানি কম্বল, একটি বালিশ, বিছানার চাদর এবং মশারি। প্রাক্-অনশন পর্বে এবড়ো খেবড়ো মেঝের উপর কম্বল শয্যায় শয়ন করতে হত। সেলে আলোর ব্যবস্থা ছিল না। বড় বড় বিছে প্রায়ই কম্বলশয্যায় উঠে যদৃচ্ছ বিচরণ করত। বিছের কামড় খেলে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সান্ত্রীকে ডাকা, সান্ত্রী ডাক্তারকে খবর দিলে তিনি এসে সেলের তালা না খুলেই ইঞ্জেকশান দিয়ে যেতেন। গরাদের ওপারে ডাক্তার, এপারে দাঁড়িয়ে বৃশ্চিকদষ্ট বন্দী। ইঞ্জেকশান নেওয়ার পর আবার অন্ধকারে সেই শয্যা। অনশনের পর শোয়ার জন্য তক্তার

ব্যবস্থা হয়েছে। বন্দীকে দেয় তিনখানা কম্বলের একটির বদলে বিছানার চাদর, বালিশ, ওয়ার এবং মশারি মঞ্জুর হয়েছে। সেলে এসেছে বৈদ্যুতিক আলো। কয়েকমাস পরে তক্তার বদলে খাট সরবরাহ করা হয়। সেটা হয় আমরা যাওয়ার বেশ কিছুদিন বাদে।

'কিচেন' পরিচালনার জন্য পালা করে এক এক মাস এক এক ব্যাচের উপর দায়িত্ব পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যবস্তু এক সঙ্গে নিয়ে রান্নার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের সংখ্যা অনেক কম। তাই খাদ্যের মান খুব উন্নত নয়। এই ওয়ার্ডের দোতলায় ও তেতলায় থাকেন বিহারের বন্দীরা। "বিহার কাশের" যোগেল সুকুল, সুরজ নারায়ণ চোবে, নানকু সিং, শ্যাম ভর্তুয়া। ডাঃ গয়াপ্রসাদ এদের সহ অভিযুক্ত হলেও যাবেন তিন নম্বর ওয়ার্ডে। ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণে হাতমুখ ধোয়ার জন্য দুটি জলের ট্যাঙ্ক। একপাশে স্নানের জন্য সিমেন্ট বাঁধানো হাওদা। ওয়ার্ডের ঠিক মাঝখানটিতে সেই শেড। খাওয়া শেষ হতে প্রায় রাত আটটা। সেলে 'লক আপ' বা তালা বন্ধ হতে হবে নয়টায়, ততক্ষণ প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করা যায়। প্রধান প্রাচীরের কাছে যেতে বাধা নেই। বিহারের বন্দীরা হিন্দুস্তান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। গয়া ষড়যন্ত্র মামলাটিও আন্তঃ প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলারই ফলশ্রুতি। ওঁরা সবাই এলেন দেখা করতে। বিশেষতঃ 'মাষ্টার মশায়' অর্থাৎ প্রভাত চক্রবর্তীর সঙ্গে। কথাবার্তার ফাঁকে নানকু সিং মন্তব্য করলেন, "ইঁহা কা ভোজন যো হ্যায়, উস্‌মে পদারথ্ নেহি," অর্থাৎ এখানকার খাওয়ার কোনও সারবস্তু নেই। আমাদের কাছে অবশ্য তখন 'ভোজনে পদারথ্' আছে কিনা, সেটা বড় প্রশ্ন নয়। পরে রাত আটটা অনেকদিন নয়টা পর্যন্ত সবাই মিলে ইচ্ছামত ঘোরাঘুরি করছি, সেই আনন্দ সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছে। একসঙ্গে খেতে বসেছি লাইন করে, গল্প-গুজবে, হাস্য-পরিহাসে পরিবেশ মুখর এটাকেই বড় মনে হয়।

সেলুলার জেলের ভিতরের জীবনের প্রথম দিনটি বেশ ভালই কাটল। এক ওয়ার্ডে খাওয়াদাওয়া, নৈশভোজনের পর পাদচারণা সেরে গেলাম পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে। এটির প্রাঙ্গণ অনেক ছোট। মাঝখানের শেডটি হলো রান্নাঘর, এখানে তিনতলায় রয়েছেন চট্টগ্রামের বন্দীরা—অনন্ত সিংহ, গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল প্রভৃতি। দোতলার একেবারে শেষ সেলটিতে আছেন ডালহৌসী স্কোয়ার বোমার মামলায় দণ্ডিত ডাঃ নারায়ণ রায়। অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, ডাঃ নারারণ রায়, তিনজনই বর্ত্তমানে প্রয়াত। তবে যখনকার কথা লিখছি, সেই স্মৃতিতে

তাঁরা জীবন্ত হয়ে আছেন, ইহলোকে নেই ভাবতে পারি না। আমাদের সহ-অভিযুক্তদের কয়েকজনের স্থান হয়েছে দোতলাতেই। আমার পাশের সেলটিতে ভাইজাগ (বিশাখাপত্তনম্) বোমার মামলায় দণ্ডিত প্রতিবাদী ভয়ংকরম্ ভেঙ্কটাচারিয়া। তিনি অনুশীলনেরই সঙ্গে সম্পর্কিত। নবাগতদের যা যা ব্যবস্থা প্রয়োজন তদারক করলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দী হিসাবে শোয়ার জন্য চওড়া, এবং মানানসই লম্বা কাঠের খাট, ছোবড়ার তোষকের উপর বিছানার চাদর, বালিশ ও মশারি। টেবিল চেয়ারও আছে। সেলজীবনের নিত্যসঙ্গী, অন্ততঃ রাত্রির সঙ্গী টুকরি এককোণে রাখা। পানীয় জল কলসীর বদলে এ্যালুমিনিয়ামের একটি ছোট্ট ঘটিতে। আন্দামানে পানীয় জল এবং স্নানের পরিষ্কৃত জলের সরবরাহ অপর্যাপ্ত নয়। সে কথা আগেই শুনেছি। পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সেলগুলির একটি বিশেষত্ব প্রথম নজরেই চোখে পড়ে। সামনের দেয়ালের এক জায়গায়, বলা যায় কোমর সমান উঁচুতে একহাত চওড়া, আধহাত উঁচু ফোকর বানানো। প্রথম পর্বে যে সব বিপ্লবী বন্দীরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেয়াড়া বলে বিবেচিতদের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সেলগুলিতে রাখা হত একমাস নির্জন কারাবাসের শাস্তি দিয়ে। প্রায় চব্বিশ ঘন্টা বন্ধ সেলের মধ্যে কাটাতে হত। 'খাটুনী,' অর্থাৎ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতদের জন্য জেলকর্তৃপক্ষের বরাদ্দ কাজ গলিয়ে দেওয়া হত ঐ ফোকর দিয়ে। কাজ বুঝে ফিরিয়ে নেওয়া ঐ একই পথ দিয়ে। খাবার থালা বন্দীর কাছে পেঁৗছে দেওয়া এবং ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা একই উপায়ে। করিডরে দাঁড়ালে ডান-পাশে নজরে পড়ে "রস আইল্যাণ্ড" (Ross Island) আর সামনে "ফোনিক্স বের" (Phoenix Bay) কুলহীন তরঙ্গভঙ্গ আন্দামান সী পর্যন্ত প্রসারিত। কিন্তু সেলে তালাবন্ধ অবস্থায় সামান্যই দৃষ্টিগোচর হয়। ছোট্ট দরজাটির গরাদ ধরে দাঁড়ালে যেটুকু দেখা যায়, সেটুকুই সান্ত্বনা।

আমরা যখন গিয়েছি, কিছু সংখ্যক বন্দী সেলে বন্ধ হওয়ার বদলে করিডরে থাকার সুযোগ পেয়ে থাকেন। যাঁরা জেল অফিসে কেরাণীর কাজ পেয়েছেন, তাঁদের বলা হয় কন্‌ভিক্ট ওয়ার্ডার। তাঁরা এ সুযোগ পান। যাঁদের উপর যে মাসে 'কিচেন' পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে, তাঁরা সুযোগটি পেয়ে থাকেন সেই মাসের জন্য। যাঁরা লাইব্রেরীর দায়িত্বে আছেন তাঁরা এবং মেডিক্যাল গ্রাউণ্ডে, অর্থাৎ স্বাস্থ্যের কারণে চিকিৎসকের নির্দেশে কয়েকজনকে অনুরূপ সুবিধা দেওয়া হয়। শেষোক্ত কারণে আমিও করিডরে বন্ধ হওয়ার সুবিধা পেয়ে গেলাম।

ঠিক সেই দিনটিতে কড়িডরে বন্ধ হওয়ার সুযোগ পেয়ে কি ভালই না

লেগেছিল। হোক না তার সীমানা একদিকে দেওয়াল, আর অন্যদিকে লোহার গরাদ দেওয়া তালাবন্ধ দরজা। দুই সীমানার ভিতরে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত কয়েক-বার পদচারণা করি, ডাঃ নারায়ণ রায়ের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে নীচে সাগর দেখার চেষ্টা করি। সেদিনটা বুঝি কৃষ্ণপক্ষের রাত। নারিকেল বাগানের ফাঁকে ফাঁকে সাগর চোখে পড়ে না। শুধু দেখা যায় ঢেউগুলি দ্বীপের শিলাতটে আছড়ে শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়ছে, আমার সেলটির সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে লবণাম্বুরাশির ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাসের আলোক কিছুক্ষণ চোখে পড়ে। চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে গরাদ ধরে বসি, কিছুক্ষণ পড়ে চাঁদ উঠলে দেখি সমুদ্র অশান্ত আবেগে ফুঁসে উঠেছে, কান পেতে তার গর্জন শুনি। শুনতে শুনতে মন স্মৃতির উজান বেয়ে চলে যায় পিছনের দিকে। সেলুলার জেলের বর্ণনা প্রথম পড়েছিলাম বোধ হয় ১৯২৬-২৭ সালে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "নির্বা-সিতের আত্মকথা" বইটিতে। উপেন্দ্রনাথ লঘু রসিকতার মেজাজে বইখানা লিখে গেলেও যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সেলুলার জেলকে নরক বলে মনে হয়। সান্ত্রী এবং ভীমকায় পাঠান ও পাঞ্জাবী পেটি অফিসারদের মধ্যে যেন যমদূতের কল্পনা জীবন্ত রূপ ধরেছে। বিপ্লবী বন্দীদের প্রতি জেল-কর্তৃপক্ষের আচরণ প্রীতিকর মনে হওয়ার কোনও অবকাশই নেই। তবু মোটের উপর এটুকু বুঝেছিলাম, যে পথ বেছে নিয়েছি, তার শেষ হবে হয়ত ফাঁসীর মঞ্চে, নতুবা ঐ সেলুলার জেলে। বিপ্লবী মুক্তিসৈনিকদের পক্ষে ঐ জায়গাটি পরীক্ষার স্থান এবং তীর্থও বটে। নরক-যন্ত্রণার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যদি দেশে ফিরি, তবে মাথা উঁচু করেই ফিরবো। সদ্যযৌবনে পা দেওয়া রোমান্টিক মন আবছাভাবে যে কথা ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তা সত্য হয়েছে আমার জীবনে। যুগান্তের যাত্রী আমরা, ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের রচয়িতা অগণিত নামহীন সৈনিকদের একজন হয়ে এসেছি সেই ইতিহাসেরই এক পীঠস্থানে। সেলুলার জেলকে 'ক্ষুধিত পাষাণ' আখ্যা দেওয়া বোধ হয় ভুল হবে না। বন্ধ সেলগুলির চার দেয়াল কত ঘটনার, বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন, অবমাননা ও লাঞ্ছনার সাক্ষী। যদি দেয়ালগুলি মুখর হয়ে উঠতে পারত, তাহলে সেই সঙ্গে কত গৌরবময় অসমসংগ্রাম ও প্রতিরোধের কাহিনী জীবন্ত হয়ে উঠত।

হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শত্রুর কারাগারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার জন্য অসাধারণ দৃঢ়সংকল্প, আদর্শনিষ্ঠা এবং বেপরোয়া মনোভাব কত-খানি প্রয়োজন, তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যেরা বুঝতে পারে না, রণাঙ্গনে অস্ত্র হাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে ঝাঁপিয়ে পড়ার একটা উন্মাদনা আছে। জেল-

খানার লড়াইতে উন্মাদনার অবকাশ নেই। প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে হবে একদিন-দুদিন নয়, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। বিগত তিন বছরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি এই লড়াইতে নিজের সঙ্গেও প্রতিদিন বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়। শরীর বিদ্রোহ করে, মন এক দুর্বল মুহূর্তে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভাবে হার মেনে নিই। হয়ত তাতে অপমান আছে, তবু যন্ত্রণার তো উপশম হবে। কঠোরভাবে বিদ্রোহী শরীর আর ভেঙেপড়া মনের লাগাম টেনে ধরে প্রস্তুত হতে হয় প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্যে, প্রতিটি দিন একই রকম। কোনও যুদ্ধবিরতি নেই, ছেদ নেই। এই ধরনের সংগ্রামে স্বাভাবিক ভাবেই কখনও কখনও ভাঁটা পড়ে। সহযোদ্ধারা একত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সাময়িকভাবে পিছু হটার পর। তারপর আবার নতুনভাবে শুরু হয় অসম শক্তিপরীক্ষার পালা। কেউ কেউ ভেঙে পড়ে স্থায়ীভাবে হার মেনে নেয়। কেউ বা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। প্রথম পর্বে আত্মহত্যাও করেছে কেউ। তবু মোটের উপর বেশীর ভাগ বিপ্লবী মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া সোজা রেখে মেয়াদ শেষ করেছেন। মুক্তিলাভের পর আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিঘ্নবিপদে ভরা জীবনের খরস্রোতে, স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গে। মুক্তিপথের অগ্রদূত, পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহী সেই সব বিরাট শক্তিধর পূর্বসূরীদের স্মৃতিতে পবিত্র সেলুলার জেলে আমিও এসে পড়েছি। এই পর্বে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গণজাগরণের প্রবাহ অনেক বেশী শক্তিসঞ্চয় করেছে। তাই দ্বিতীয় পর্বে আমাদের অগ্রবর্তীরা একবারের সংগ্রামেই রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাপ্য বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা অর্জন করেছেন। এখন শুরু হয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এক লড়াই। নির্বাসনের দিনগুলিকে যেন আমরা বাইরের স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে পারি। ইতিহাস আমাদের পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। যখন বাইরে যাবো, যেদিনই যাই, যাতে ইতিহাসের গতিবেগের নাগাল পেতে পারি। ছুটে চলতে পারি তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, জায়গা করে নিতে পারি মাতৃভূমির মুক্তিসেনানীদের বাহিনীর প্রথম সারিতে। অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে সেলের ভিতরে এসে শয্যায় গা এলিয়ে দিই। কখন যে ঘুমে ঢলে পড়ি, তা টেরও পাই না।

সকালে ঘুম ভাঙ্গার পর সেলের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতে চোখে পড়ে মনোরম দৃশ্য। ভোরের সমুদ্র শান্ত, তার পক্ষে যতটা নিস্তরঙ্গ হওয়া সম্ভব তাই যেন হয়েছে। 'রস আইল্যান্ডে'র উত্তর দিকে শৈলমূলে একটা পাষাণ বাহু জলের মধ্যে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। প্রায় সবটাই সাগরের বুকে, একটুখানি শুধু

উপরে জেগে আছে। সেখানে ঢেউগুলি এসে আছড়ে পড়ে, শুভ্র ফেনোচ্ছ্বাসে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। কত যুগ ধরে চলেছে এই খেলা কে জানে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখার পরক্ষণেই মনকে নেমে আসতে হয় কুশ্রী কঠিন বাস্তবে। বর্মী ভাঙ্গী প্রত্যেক সেল থেকে রাতের আবর্জনা সহ টুকরিগুলিকে একটি একটি বার করে ঠিক দরজার সামনে সাজিয়ে রেখে যাচ্ছে। সবগুলি বার করার পর এক সংগে একটির উপরে আর একটি বসিয়ে কয়েকটি এক সংগে নিয়ে যাবে। কোনো এক বন্ধু তাকে কিছু বলতে গেলে দুর্বোধ্য ভাষায় অনর্গল বকে চলে। অর্থ না বুঝলেও সেগুলি যে প্রীতি সম্ভাষণ নয়, তা হৃদয়ংগম করা মোটেই কঠিন নয়। বোঝা গেল বেশ ক্রুদ্ধও হয়েছে। বন্ধুটি চুপ করে গেলেন। প্রাতঃকৃত্য নীচেই সেরে আসবো স্থির করে রওনা হই। 'কিচেন শেড'টির পিছনে একটি হাওদায় মোটা পাইপ থেকে নীল লবণাম্বু এসে পড়ছে। হাওদার একটু দূরে মানুষ সমান উঁচু টিনের বেড়া, আলকাতরা লেপা। বেড়ার ওপারে ৪/৫টি পায়খানা। উপরে টিনের চাল। পাশাপাশি কয়েকটি খোপ, তিনদিকে টিনের বেড়া, সামনেটা খোলা। "লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়।" প্রবচনটির সত্যতা ত' বন্দীজীবনের প্রথম দিন থেকেই বুঝতে শুরু করেছি। এখানে লজ্জার শেষ রেশটুকু বিসর্জন দিতে হয়। কয়েকজন পায়খানায় বসে আছেন। তাঁদের সামনে দিয়ে গিয়ে দেখতে হবে, কোন্‌টি খালি, সেটি থেকে 'মগ' নিয়ে এসে হাওদা থেকে লবণজল সংগ্রহের পর আবার সকলের সামনে দিয়েই খালি খোপটিতে গিয়ে বসতে হবে। বাধ্য হয়ে সবাই চোখ নীচু করে বসে থাকেন। পায়খানা থেকে ফিরে স্নান সেরে উপরে যাওয়াই শ্রেয় মনে হয়। স্নানের ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালই বলতে হবে। সিমেন্ট দিয়ে তৈরী হাওদার দুপাশে সিমেন্ট বাঁধানো জায়গায় দাঁড়াতে হয়। সিমেন্টের দেয়াল দিয়ে খোপ করা। স্নানের ব্যাপারে ছেলেদের তেমন আব্রুর প্রয়োজন নেই। সেদিক থেকে ব্যবস্থাতে আপত্তির কিছু নেই। স্নান সেরে দোতলায় উঠে সেলের সামনের গরাদেতে ভেজা কাপড় শুকোতে দেবো। বন্ধুবর ভয়ংকর আচারিয়া ** গরাদের গায়ে দড়ি টাঙিয়ে রেখেছেন। ভেজা কাপড় মেলতে গিয়ে এক অনির্বচনীয় অভিজ্ঞতা। সাগরের বুকে সূর্যোদয় আগে কখনও দেখি নি। কবির ভাষায় "প্রথম দিনের সূর্য্য"কে অভিবাদন জানাবার অনুভূতি নিয়ে দুচোখ মেলে চেয়ে থাকি। সাগর যেখানে আকাশের সংগে মিশেছে সেই অতিদূর দিক্‌চক্রবালে সূর্য ওঠে যেন সাগরের জলে স্নান ক'রে। প্রকাণ্ড একটি ঝক্‌ঝকে তামার থালার মতো

** সহবন্দীরা তাঁর নামটিকে ছোট করে এইরূপ দিয়েছিলেন।

দেখায়। যতদিন ছিলাম সেলুলার জেলে, প্রায় প্রতিদিনই উদয়সূর্যকে প্রথম নমস্কার জানিয়ে দিনের কাজ শুরু হয়েছে।

সেলুলার জেলের বাইরের ও ভিতরের পরিবেশের সংগে পরিচিত হওয়ার আনন্দ প্রথম মাসখানেক বেশ বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়। বিপ্লবী বন্দীরা রয়েছেন যথাক্রমে পাঁচ, ছয়, দুই ও তিন নম্বর ওয়ার্ডে। চার নম্বর এবং সাত নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে সাধারণ কয়েদীরা, তারা তিন মাসের বাসিন্দা। কেউ কেউ বাইরে যাওয়ার পরে কোন অপরাধে দণ্ডিত হয়ে মেয়াদ খাটতে আসে। দুই নম্বর ওয়ার্ডে আছেন অনুশীলন সমিতির রাধাবল্লভ গোপ, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, প্রমথ ঘোষ প্রভৃতি। রাধাবল্লভ বাবুর মেয়াদ চৌদ্দ বৎসরের। তাঁর কাছে এক অস্ত্র-ভাণ্ডার ধরা পড়েছিল। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী হিলি রেলষ্টেশন মেল লুণ্ঠনের মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত। স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ফাঁসীর হুকুম হয়। হাইকোর্ট তা মকুব করে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেয়। ঐ মামলায় স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে ফাঁসীর হুকুম হয়েছিল আরো তিনজনের—হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, সত্য চক্রবর্তী ও সরোজ বসু। হাইকোর্ট হৃষীকেশ ভট্টাচার্যের জন্য যাবজ্জীবন কারা-দণ্ড এবং সত্য চক্রবর্তী ও সরোজ বসুর দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। প্রমথ ঘোষ ঝরিয়া ডিনামাইট মামলায় সাত বৎসর সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে এসেছেন। এই ওয়ার্ডেই আছেন মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার দণ্ডিত বন্দীরা—কামাখ্যা ঘোষ, সুকুমার সেন, বিমল দাশগুপ্ত, প্রভৃতি। আছেন লেবংএ গভর্ণর অ্যাণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত মধু ব্যানার্জী, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী প্রভৃতি। সবার নাম এখন একসংগে মনেও পড়ছে না, লেখা সম্ভবও নয়। যত চেষ্টা করি, কয়েকজনের নাম বাদ পড়বেই। দুই নম্বর ওয়ার্ড থেকে সমুদ্র দেখার কোনও উপায় নেই। সমুদ্রের গর্জনও কানে আসে না। তিন দিকে দৃষ্টি দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। একদিকে শুধু পাঁচিলের উপর দিয়ে পাহাড়ের এক অংশ নজরে পড়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়ে তিন নম্বর ওয়ার্ডের বৈশিষ্ট্য আছে। দোতলা তিনতলা থেকে নজরে পড়ে 'ফোনিক্স বে', ঘোড়ার খুরের আকারে পর্বতশ্রেণীর দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত। দুধারের পর্বতশ্রেণীকে সংযুক্ত করেছে যে পাহাড়টি, তার গায়ে বেশ কয়েকটি ছোট ছোট খাঁড়ি। প্রকৃতির নিজের হাতে রচিত পোতাশ্রয়। জাহাজটিকে অমনি একটি খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। মনে হয় যেন কোন অতিকায় রঙ্গমঞ্চের অঙ্গসজ্জা। 'ফোনিক্স বে'র অপর দিকটি বেষ্টন করে রয়েছে 'মাউণ্ট হেরিয়ট'। তিন নম্বর ওয়ার্ড থেকে দেখা যায় আগাগোড়া নারিকেল বনরাজিতে ঢাকা। মাউণ্ট

হেরিয়টের চূড়াই অ্যাবারডীন দ্বীপের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। সেখানে চীফ কমিশনারের গ্রীষ্মাবাস। সবুজের সমারোহে চোখ আমার জুড়িয়ে যেত। কোন উপলক্ষ পেলেই চলে যেতাম এই ওয়ার্ডটির তিনতলায়। উপলক্ষের অভাব ছিল না। এখানে ছিল লাইব্রেরী। 'কমিউনিষ্ট কনসোলিডেশানে'র নিজস্ব সভা ছাড়াও বিশেষ দিন উদ্‌যাপনের সভা অনুষ্ঠিত হত। এই ওয়ার্ডে ছিলেন লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বিজয়সিংহ, বটুকেশ্বর দত্ত, জয়দেব কাপুর, শিউ বর্মা, কমল তেওয়ারি। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত ধন্বন্তরি, উটকামণ্ড ব্যাঙ্কলুঠ মামলায় দন্ডিত শম্ভুনাথ আজাদ, খুশিরাম মেহতা। আর ছিলেন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকার সম্পাদককে হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত সুনীল চ্যাটার্জী, বরিশালের নলিনী দাস, বর্ধমানের হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রভৃতি।

সেলুলার জেলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, এবং ভিতরের পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে দু-তিনমাস কোথা দিয়ে কেটে গেল। দিনের বেলায় বেশীর ভাগ সময় কাটাই সমুদ্র দেখে, আর বিকেলটা ছয় নম্বর ওয়ার্ডের প্রাঙ্গণে খোলা আকাশের নীচে। রাতের খাওয়ার ঘণ্টা না পড়া পর্যন্ত ঘাসের উপর বসে থাকি। কখনও একলা, কখনও বন্ধুরা পাশে থাকেন। বাংলার জেলের নিঃসঙ্গ সেলে একঘণ্টা বন্ধ থাকার অভিজ্ঞতার পর এই মুক্তির স্বাদটুকুকে তারিয়ে তারিয়ে ভোগ করি। হোক না সে মুক্তি চার দেয়ালে বন্দী। রাতে করিডরে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে নীচের অন্ধকারে সাগরের বুকে শুভ্র ফেনিল তরঙ্গভঙ্গের খেলা দেখার চেষ্টা করি, চাঁদ ওঠার পর উত্তাল সমুদ্রের দামাল গর্জনের সঙ্গে নিজের সমস্ত অনুভূতিকে মিশিয়ে দিই। আমরা আসার মাস দুই পরে আবার 'মহারাজা' জাহাজ পোর্টব্লেয়ারে নোঙর করে। দ্বীপের সঙ্গে বহির্জগতের একমাত্রযোগসূত্র। প্রতি জাহাজে নতুন কয়েদী চালান আসে, রাজনৈতিক ও সাধারণ দুইই।

রাজনৈতিক বন্দীরা এলে দেশের সর্বশেষ হালচাল শুনতে চান সবাই। কিন্তু নবাগতদের অনেকের পক্ষে কিছু বলা সম্ভব হয় না। তাঁরা হয়তো এসেছেন মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল বা ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে, যেখানে তাঁরা বাইরের দুনিয়ার কোনও খবরাখবরই পেতেন না। জাহাজে দেশ থেকে আত্মীয়স্বজনের চিঠি আসে, কারুর জন্য মানি-অর্ডারে টাকা আসে। প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রবেশ-পথে যে নোটিশ বোর্ড আছে, সেখানে তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়, পি. আই. নং অমুক অমুকের নামে মানি অর্ডার আছে। জেলগেটে গিয়ে সই করে নিতে হবে। টাকা অবশ্য জেল অফিসে জমা থাকে। বন্দীরা কিছু কিছু ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিষ, যথা, মাখন, চিনি ইত্যাদি কিনতে পারে। চিঠি বিলি করে আমাদেরই

বন্ধুরা, যারা জেল অফিসের কেরাণীর কাজে নিযুক্ত। দেশ থেকে আলু, কুমড়ো, প্রভৃতি সব্জী আমদানী করতে হয়। জাহাজেই আসে। কিচেনে বরাদ্দ পরিমাণ এসে পেঁছলে ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে জানানো হয়। যদি কেউ দেশের সব্জী আস্ত অবস্থায় দেখতে চায়। স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় শুধু একরকমের ডাঁটা শাক। ফলের মধ্যে পেঁপে, কলা, মোষের দুধ। হাসপাতালে রোগীরা ঐ ফল ও দুধ পায়। চিকিৎসকের সুপারিশে হাসপাতালে ভর্তি না হলেও কেউ কেউ পেয়ে থাকে। ইংরাজী উপন্যাসে পড়েছিলাম এমনি এক দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে জাহাজ আসার ঘটনাটি কত গুরুত্বপূর্ণ। নিজে এবার উপলব্ধি করছি। কোয়া-রাণ্টাইন ওয়ার্ডে থাকার সময় মায়ের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তর এসেছে। অবশ্যই সরাসরি নয়। 'আই. বি' অফিসের 'সেন্সরড অ্যাণ্ড পাস্ড্' (Censored and Passed) শীলমোহর অঙ্গে ধারণ করে। চিঠির উত্তর লিখে দিতে হবে এই জাহাজেই, নতুবা আবার দুইমাসের প্রতীক্ষা। চিঠি মায়ের কাছে পেঁছবে, Censored and Passed, D. I. G., I. B., C. I. D, Bengal, শীলমোহরে ভূষিত হয়ে। চিঠির ডানদিকে উপরের অংশে যখন লিখি, 'সেলুলার জেল, পোর্ট ব্লেয়ার', তখন শিহরণ না হলেও অনেকটা ঐ ধরনের অনুভূতি জাগে। কুখ্যাত হলেও একটা ঐতিহাসিক স্থানে রয়েছি, শৃঙ্খলিত হলেও ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস রচয়িতাদের একজনরূপেই দিন অতিবাহিত করে চলেছি। বন্দীশালায়ও সংগ্রামের অবসান হয় নি। ধরণটা বদলেছে। জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘাতটা বড় একটা নেই। রয়েছে নিজেদের সঙ্গে, কালের গতির সঙ্গে। বন্দীজীবনের দিনগুলিকে নিষ্ক্রিয় একঘেয়েমির কাছে আত্মসমর্পণ করার বদলে রাজনৈতিক দিক থেকে সার্থক করে তুলতে হবে। বিশ্ব-ইতিহাসের গতি যেদিকে এগিয়ে চলেছে তাকে বুঝতে হবে, দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম যে নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে, তার সম্ভাবনা এবং কর্তব্যকে উপলব্ধি করতে হবে। যে অধ্যায়-গুলিকে পিছনে ফেলে এসেছি, তার হিসেব নিকেশ করতে হবে। বিচারবিশ্লেষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করে নিতে হবে ভবিষ্যতের পাথেয়।

৭

সেলুলার জেলের দিনগুলি

আমরা যখন সেলুলার জেলে যাই, ততদিনে ওখানে রাজনৈতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ গড়ে উঠেছে। সঠিক অর্থে বিপ্লবী বিশ্ববিদ্যালয়। সমস্ত দল ও গোষ্ঠী রাজনৈতিক জ্ঞানলাভের চেষ্টায় তৎপর। শুধু নেতৃস্থানীয়রাই নন, যাঁরা সাধারণ কর্মী, তাঁদেরও রাজনৈতিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। কাজটি আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। বন্দীদের মধ্যে শিক্ষাগত মানের বিচারে বিরাট তারতম্য ছিল। সেদিন ছেলেরা গুপ্তসমিতিতে যোগ দিত কৈশোরে পা দেওয়ার ঠিক মুখে, অথবা কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণের আগে। বিভিন্ন মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময়ে বেশীর ভাগ ছেলেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। জীবনের সঙ্গেই বা হয়েছে কতটুকু পরিচয়! যে কয়েকজন কলেজী শিক্ষার প্রথম ধাপগুলি উত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। আর যে কয়জন স্নাতক, অথবা স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেছে, কিংবা তারপরেও রাজনৈতিক পড়াশোনা, তথা হাতেকলমে বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পেয়েছে, তাদের সংখ্যা তো হাতে গোনা যায়।

সুতরাং প্রাথমিক কাজ হল ছাত্রদের বিভিন্ন মান অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা। তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাঠ্যসূচী তৈরী করা। অবশ্যই ধাপগুলিকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে—তিনমাস, ছয়মাস, বড়জোর এক-বছর। আরেকটি সমস্যা হল শিক্ষক সংগ্রহ করা নিয়ে। গোড়াতেই যাঁরা শিক্ষকতা করার উপযুক্ত ছিলেন, তাঁরা তো মাত্র কজন। সেইজন্যে শিক্ষক তৈরী করাকে অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। আরও বড় সমস্যা বইয়ের অভাব। দেশের জেল থেকে আসার সময় বন্দীরা যেসব সাধারণ জ্ঞানের বই আনতে পেরেছিলেন, সেগুলি তাঁদের সংগ্রহ করতে হয়েছিল এলোপাথাড়িভাবে। যার অভিভাবক বাইরে থেকে যে কয়খানি বই দিয়ে গেছেন, এবং তার মধ্যে যেগুলি জেল-কর্তৃপক্ষের অনুমতি পেয়ে ভিতরে আসতে পেরেছে, সেইগুলিই ছিল সম্বল। তবু ১৯৩৩ সালের অনশনের পর বন্দীরা নিজেদের গ্রন্থাগার গড়ে তোলা এবং পরিচালনার সুযোগ

পেয়ে সকলের বইগুলিকে একত্র করায় সংগ্রহটা মোটামুটি কার্যকরী হয়। বাইরে থেকেও কিছু কিছু বই পাওয়া যেত—যেমন ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" সম্পূর্ণ সেটটি আন্দামান বন্দীদের ব্যবহারের জন্য উপহার দিয়েছিলেন। দেশের বিভিন্ন প্রদেশের জেল থেকে বন্দীরা এখানে এসেছে। বই সেন্সারের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের জেলের কিছু কিছু তারতম্য ছিল। তার সুযোগে রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের বইও কিছু কিছু আসতে পেরেছে। আর এক ধরনের বই যথা মার্কসীয় সাহিত্য প্রধানতঃ বে-আইনীভাবে আমদানী করতে হয়েছে। এখানে বলে রাখা ভালো, রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বাইরে থেকে অভিভাবক অথবা বন্ধুরা যেসব বই পাঠাতেন, সেগুলি এসে জমা হত জেলগেটে। জেল-কর্তৃপক্ষ পাঠাত "আই. বি." বিভাগের কাছে। এই উদ্দেশ্যে পোর্টব্লেয়ারেই "আই. বি."র একটি শাখা দপ্তর খোলা হয়েছিল। সেখান থেকে যে বইগুলি অনুমোদিত হয়ে আসত, সেগুলির প্রথম পৃষ্ঠায় "আই. বি." অফিসারের সই সহ সীলমোহর করা থাকত "Censored and Passed", তার উপর আবার জেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের সই এবং সীলমোহর থাকত। যেগুলি অনুমোদিত হত না, সেগুলি জেল অফিসেই জমা থাকত। সেখান থেকে নানা কৌশলে গোপনে ভিতরে আনার ব্যবস্থা হত। জেলের জীবনে রাজনৈতিক বন্দীদের সেলগুলি কিছুদিন পর পর খানাতল্লাশীর নিয়ম ছিল। তল্লাশীর সময়ে সীলমোহরহীন বই পেলে কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করত। সুতরাং বে-আইনী বই ভিতরে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম কাজ হতো সেগুলো সীলমোহরযুক্ত সাদা খাতায় হাতে লিখে নকল করে ফেলা। কঠিন কাজ। খুব সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। যেসব বন্দীর হাতের লেখা ভালো, তাদের মধ্যে নকল করার ভারটা ভাগ করে দেওয়া হতো। তারপর আসল বইগুলি গোপন স্থানে লুকিয়ে ফেলা হত। হাতে লেখা খাতাগুলি পড়তে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে "রেশন" করে দেওয়া হতো। কেউ পুরো সময়ের জন্য খাতা পেতেন না। পেতেন এক একজন দুইঘণ্টা করে। ফলে কারোর জন্য বইয়ের বরাদ্দ হতো বেখাপ্পা সময়ে। একজন হয়তো পেলেন সকাল পাঁচটা থেকে সাতটা। তাঁকে সেলের দরজা খোলার আগেই প্রকৃতির তাগিদ ভিতরেই সেরে নিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় বসে পড়তে দেখা যেত। আবার হয়তো যাঁর বরাদ্দ হয়েছে বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা, তিনি খেলার মাঠে না গিয়ে, বা গল্পগুজবে যোগ না দিয়ে বসে বসে পড়তেন, এমন দৃশ্য প্রায়ই দেখা যেত।

সাধারণ শিক্ষার নীচের স্তরের উপযোগী বইও খুব বেশি ছিল না। সুতরাং ক্লাস নেওয়ার সময়ে শিক্ষককে অনেকখানি নিজের জ্ঞান, এবং স্মৃতির উপর

নির্ভর করে মুখে মুখে যতটুকু বলা যায়, তাই দিয়ে কাজ সারতে হত। রাজনৈতিক ক্লাসগুলিতে ঠিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা, বা কলেজী শিক্ষার ধরনটা অচল। ছাত্রদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্ন আসত। শিক্ষককে যতটা সম্ভব তার উত্তর দিতে হত।

ক্লাসগুলি চলত কঠোরভাবে বাঁধা নিয়মে। সপ্তাহে ছয়দিন সকাল আটটা থেকে এগারোটা, আবার দুপুর দুটো থেকে চারটা পর্যন্ত। রান্নাঘরে ঘণ্টি দেওয়ার যে ব্যবস্থা ছিল, তাকে ক্লাস শুরু হওয়ার সময়সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা হত। খাদ্য তৈরী হয়েছে, এই সংকেত ছাড়াও আরও নানা কাজে ঐ ঘণ্টি ব্যবহৃত হত।

যাঁরা কোনও ক্লাসে যেতেন না, তাঁরাও তিন-চারজন একত্রে মিলে পড়ার ব্যবস্থা করে নিতেন। এই ধরনের পড়ার সময়েও প্রসংগক্রমে নানা প্রশ্ন আলোচিত হত। বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখাসাক্ষাৎ, গল্পগুজব, বিভিন্ন 'ইনডোর গেম' ইত্যাদির জন্য নির্দিষ্ট ছিল রবিবার দিনটি। ঐ দিনটিই ছিল বিভিন্ন ওয়ার্ডের বন্ধুদের মধ্যে সামাজিকতা আদান-প্রদানের দিন। বিকেলটা, পাঁচটা থেকে ছয়টা/সাড়ে ছয়টা একনম্বর ওয়ার্ডের খেলার মাঠে প্রায় সবাই যেতেন, খেলোয়াড়, অথবা দর্শক হিসাবে। গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা ইত্যাদির সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা খাওয়ার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত। ওয়ার্ডগুলির বারান্দায়, অথবা ছয় নম্বর ওয়ার্ডের প্রশস্ত অংগনে ছোট ছোট ভাগে ভাগ হয়ে হাসি-গল্পের বৈঠক বসত। যারা নিয়মিত ব্যায়াম করত, তাদের পাদচারণার স্থান ছিল ছয় নম্বর ওয়ার্ড।

প্রত্যেকেই যে পড়াশোনা নিয়ে থাকতেন, তা নয়। কয়েকজন ইচ্ছে করে নিজেদের ওখানকার রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের বাইরে রেখেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হাতের কাজ, যথা কাঠের কাজ, তাঁত বোনা ইত্যাদি শেখার সুযোগকে কাজে লাগাতেন। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাখাল দের ছবি আঁকার হাত ছিল। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে আঁকার সরঞ্জাম আনিয়ে আপন মনে ছবি এঁকে সময় কাটাতেন। শিক্ষাক্রমে আমাদের একটি বড় দুর্বলতা ছিল। আমরা ভারতবর্ষের সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনও খবরই পেতাম না। এ জন্য অবশ্য আমরা নিজেরা দায়ী নই। জেলের আইনে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বন্দীদের সরকারী ব্যয়ে দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা সরবরাহ করা হত। একটি ছিল 'Statesman' এর Overseas, অর্থাৎ বৈদেশিক সংস্করণ। অন্য সাপ্তাহিক পত্রিকা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজেদের খরচে আনা যেত। বলা বাহুল্য, ভারতের

রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও পত্রিকার নামই অনুমোদিত হত না। 'Overseas Statesman' এ এক সপ্তাহে প্রকাশিত তাঁদের চোখে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেওয়া হত। আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবরও থাকত। সবই ইংল্যাণ্ডের অধিবাসীদের দিকে তাকিয়ে লেখা। তবু ওর মধ্য দিয়ে যেটুকু জানা যেত, তার ভিত্তিতেই আমাদের আলোচনা হত। "সঞ্জীবনী" পত্রিকাটি আমাদের হাতে আসত কাঁচিতে কাটা, এবং অনেকখানি মসীলিপ্ত অবস্থায়। ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং অর্থনীতি সম্বন্ধে কয়েকখানি কলেজপাঠ্য বই অবশ্য ছিল। সেই তুলনায় বিদেশের, বিশেষতঃ ইউরোপের সমকালীন পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা অনেক বেশী খবর পেতাম। 'Newyork Times' পত্রিকার রবিবাসরীয় সংস্করণটি আনাবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল। ওই সংস্করণটিতে বিশেষ বিশেষ রিপোর্ট, বিশেষ নিবন্ধ ইত্যাদি থাকত। নাৎসীবাদের অভ্যুদয়, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, মস্কোতে জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, বুখারিন, রাদেক প্রভৃতির বিচার, সোভিয়েতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য ঐভাবেই আমরা জেনেছি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রী বাহিনীর কি হল জানবার জন্যে আমরা উৎসুক হয়ে থেকেছি।

আমাদের কারো কারো মনে একটা প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিত। দেশের জন্য আমরা জীবনকে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু সেই দেশের সম্বন্ধে কতটুকু জানি। ভারতের বিশাল জনসমুদ্র, সুপ্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি, এক কথায় সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে কতটুকু খবর রাখি! আমি নিজে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয়ে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, খুঁটিয়ে পড়েছি। উত্তর জীবনে যে সব বিষয় নিয়ে পড়াশোনা, করেছি, এবং লিখেছি, যথা ভারতের ভাষা সমস্যা, নৃতত্ত্ব লোকসংস্কৃতি, সব-কিছুর হাতে খড়ি হয়েছিল এইভাবেই।

সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি আসত জাহাজে। একমাস দেড়মাস পরপর একসঙ্গে অনেকগুলি সংখ্যা। সেগুলি তিন নম্বর ওয়ার্ডের খাওয়ার হলের এক কোণায় টেবিলে সাজিয়ে রাখা হত। বেশীরভাগ বন্দীর পক্ষেই ইংরাজী পত্রিকাগুলি পড়ে বোঝা সহজ ছিল না। সেইজন্য কয়েকজনকে ভার দেওয়া হত পত্রিকাগুলি খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় অংশগুলি চিহ্নিত করে রাখা। পনেরো দিন পর পর আগ্রহী শ্রোতাদের সারমর্ম বুঝিয়ে দেওয়া হত।

জেলখানাও তো একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সেখানে বিরামহীন লড়াই চলে। নানা ধরনের। সংঘাত বাধে জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। লড়াই চলে নিজের শরীও

মনের সঙ্গে। বিরামহীন একঘেয়েমির বোঝা এক এক সময়ে গুরুভার মনে হয়। তারপর আছে বন্দী যৌবনের দৈহিক ক্ষুধার দুরন্ত তাড়না। বেশীরভাগ বন্দীই পড়াশুনা, খেলাধুলা, ব্যায়াম, গল্পগুজব, হাসিঠাট্টা, গান ইত্যাদির সাহায্যে সেই তাড়নাকে প্রশমিত করে রাখতেন। জেলের জীবনে কৌতুকপ্রিয় হাস্যরসিক বন্ধুদের সাহচর্য একটা বড় সম্বল। শুধু সেলুলার জেলেই নয়, বিনাবিচারে আটক বন্দীশিবিরগুলিতে যে সব কথাবার্তা হাস্যরসের খোরাক যোগাত, এবং তার ফলে যে কথাগুলি খুব প্রচলিত হত, তার অনেক কিছু বাইরের জীবনে এখন বহুলভাবে প্রচলিত হয়ে গেছে।

আমাদের সহ-অভিযুক্তদের মধ্যে হাস্যরসিক বা কৌতুকশিল্পী, হিসাবে দুই-জনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে। একজন সুরেন ধরচৌধুরী, আর একজন দ্বিজেন তলাপাত্র। যাঁরা গান জানতেন, তাঁদের মধ্যে দুজনের গানের রেশ আজও আমার কানে বাজে। একজন হলেন লেবং ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত মনোরঞ্জন ব্যানার্জী। তিনি এক সন্ধ্যায় ছয় নম্বর ওয়ার্ডের দোতলার কোনায় বসে গান শুনিয়েছিলেন, "ওরা কার কথা কয় বনময়, ওরে কিশলয়।" আর একজন হলেন বার্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত শান্তি গোপাল সেন। তাঁর যে গানটির কয়েকটি কলি আজও আমার মনে পড়ে, সেগুলি হল,

> "হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে
> হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।
> ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—
> "দীপালিকায় জ্বালাও আলো···জ্বালাও আলো···"

ডাঃ নারায়ণ রায় থাকতেন পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের একেবারে শেষ সেলটিতে। সারাদিন কাটত অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায়। সন্ধ্যায় তাঁর সেলের সামনের করিডরে বসত চায়ের আসর, আড্ডা এবং গানের আসর।

কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে নাটক এবং যাত্রাও হত। আমাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অভিনয়ে দক্ষতা ছিল। আর কয়েকজনের ছিল মঞ্চসজ্জায়। সামান্য উপকরণ দিয়েই তাঁরা একটা সফল মঞ্চপরিবেশ সৃষ্টি করতেন। আমরা যাওয়ার পর একটি নাটক "সীতা", এবং একটি যাত্রা "জনা" অনুষ্ঠিত হয়েছিল। "জনা" পালায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রভাকর বিরুণী ও রাজেন চক্রবর্তী, এই দুইজনের কথা বিশেষভাবে মনে আছে, এঁরা সেজেছিলেন গঙ্গারক্ষক। গায়ে মুখে কালি মেখে চোখের পাতা উল্টে নাকিসুরে কথা বলে ভূতের ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, তা অনেক পেশাদার অভিনেতারও ঈর্ষার

বস্তু হতে পারে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই দুইটি ছোটখাটো নাটক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটি ম্যাক্সিম গোর্কীর "মা", আরেকটি আমার লেখা একটি পোণ্টার নাটিকা। এখন মনে হয়, সেটিতে কি ছেলেমানুষী না করেছি—শ্রমিক ধর্মঘট থেকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিনতি কয়েকটি দৃশ্যের মধ্যে। তবুও অভিনেতা-দের আবেগ, এবং "ইন্টারন্যাশনাল" গানের দৌলতে সেটি জমে গিয়েছিল।

আমরা যখন সেলুলার জেলে গিয়েছি, তখন সামান্য দু একটি ঘটনা, এবং খিটিমিটি ছাড়া জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও সংঘাত বাধে নি। সেই সময়টিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এদেশে নতুন শাসনসংস্কার আইন, অর্থাৎ 'প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন' প্রবর্তিত করেছেন। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ শাসিত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। —জাতীয় কংগ্রেসের নেতারা যাতে এই শাসনসংস্কারে অংশগ্রহণ করেন, সেজন্য বৃটিশ গভর্ণমেন্ট খুব সচেষ্ট। এ হেন পরিস্থিতিতে আন্দামান বন্দীদের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টির দ্বারা অবস্থাকে জটিল করে তোলা যে সমীচীন হবে না। সে কথা সুচতুর বিদেশী শাসক ভালভাবেই বুঝেছিল।

তবু যৌবনের দুরন্ত তাড়নায় জনাবয়েক বন্দী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। বড় করুণ সে কাহিনী। আমাদের মধ্যে বিবাহিত ছিলেন বোধ হয় জনাচারেক। ডাঃ নারায়ণ রায়, রাজশাহীর অমলেন্দু বাগচী, বরিশালের ফনী দাস, এবং মাদারীপুরের সুরেন কর। ডাঃ নারায়ণ রায় কিভাবে দিন কাটাতেন, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। অমলেন্দু বাগচীও অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা নিয়ে থাকতেন। তিনি ছিলেন আপনভোলা নির্বিকার মানুষ। কোনও কিছুতেই তাঁর মনে বিকার ঘটেছে কিনা বাইরে থেকে বোঝা যেত না। কিন্তু ফণী দাস এবং সুরেন কর মানসিক ভারসাম্য একেবারেই হারিয়ে ফেলেন। ফণী দাস বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী (তখন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে ঐ নামেই অভিহিত করা হত) ফজলুল হক সাহেবের সহৃদয়তায় মুক্তিলাভ করেন। সুরেন করকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়। তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পাবার পর আবার সেলুলার জেলেই ফিরে আসেন।

যারা পুরোপুরি উন্মাদ হয়নি, অথচ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল, তাদের মধ্যে বাচ্চুলালের কথা একেবারে গোড়াতেই লিখেছি। ভূপেশ (পদবীটা ভুলে গিয়েছি) নামে একটি ছেলে। বয়স হয়তো ১৮/১৯। তার আচরণে দুরন্তপনা ছিল না। তবুও মাঝে মাঝে দেখা যেত কোনও ওয়ার্ডে উঠোনের এককোনে দাঁড়িয়ে আপনমনে বিড়বিড় করে বকে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলে জবাব

দিত, "দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া Lapidus মুখস্থ করত্যাছি।" Lapidus এর একটি বই তখন আমাদের মার্কসীয় অর্থনীতির প্রথম পাঠ্য ছিল।

আমার পক্ষে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ধীরেন ভট্টাচার্যের মানসিক বিকৃতি। ধীরেন ভট্টাচার্য ছিল আমার রাজশাহী কলেজের সহপাঠী, ছাত্র আন্দোলনের এবং অনুশীলন সমিতির সহকর্মী। আমরা দুজনে ১৯৩১ সালে বি. এ. পাশ করি। পরীক্ষার ফলপ্রকাশের পর আমি আসি কলকাতায় অনুশীলন সমিতির গোপন সংগঠনের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদের ভার নিয়ে। ধীরেনবাবুকে পাঠানো হয় অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বের তরফ থেকে, পাঞ্জাবে। বিপ্লব প্রচেষ্টা সংগঠিত করার জন্যে। সেখানে সে একবছর পুলিশের নজর এড়িয়ে টিঁকে থাকতে পেরেছিল। তারপর গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তারের পর লাহোর দুর্গে তার উপর অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়। সইতে না পেরে সে স্বীকারোক্তি করে। অবশ্য রাজসাক্ষী হতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে। তখনকার দিনে বিপ্লবী দলের কোন কর্মীর পক্ষে পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করাটা ছিল শুধু অপরাধ নয়, সারাজীবনের কলঙ্ক। যে করত, তার মনেও জন্মাত হীনমন্যতাবোধ। এবং অন্যরাও তাকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখত। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার নেতারা, বা অন্য আসামীরা কেউই ধীরেণের সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করেনি। বরং সহানুভূতির দৃষ্টিতেই দেখেছে। সে ছিল একজন যথেষ্ট দায়িত্বশীল কর্মী। জেলের ভিতরে আমাদের কোনও গোপন আলোচনায় তাকে ডাকা হত না। এইটুকু যে তার মনে কতখানি আঘাত করেছিল, সেকথা প্রথমে বুঝিনি। অন্তরঙ্গ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমিও বুঝিনি। সেলুলার জেলে যাওয়ার পর, সে নিজেকে অন্য সবার থেকে আলাদা করে রেখেছিল। একলা একলা দিন কাটাতো। সেও আমারই মতো পাঁচনম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় থাকতো। আমি তখন ওখানে অনুশীলন সমিতির কর্মীদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান, রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা ও তর্কবিতর্ক নিয়ে এত ব্যস্ত থেকেছি, যে ধীরেনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় পাইনি। ধীরেণের মানসিক বিকৃতির লক্ষণ ধরা পড়ে ১৯৩৭ সালে, গ্রীষ্মের সময়ে। সেই সময়টাতে পানীয়, এবং স্নানের জলের খুব টানাটানি হত। স্নানের জল সরবরাহ হলে হেড জমাদার লালু সিং প্রত্যেক ওয়ার্ডে এসে ঘণ্টি বাজিয়ে স্নানের জন্য সবাইকে তাগিদ দিত। ধীরেণ পরপর কয়েকদিন স্নান করে নি। তার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি, এবং আমাদের মামলার অন্যতম নেতা প্রভাত চক্রবর্তী দুজনেই খুব হতবাক হয়ে যাই। ধীরেণ আমাকে বলে, "আমাকে ধীরেণবাবু বলে ডাকবেন না। আমার নাম

রাসবিহারী।" (পরে আরো নানা কথাবার্তায় বুঝেছি, সে তখন নিজেকে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু বলে মনে করছে।), প্রভাত চক্রবর্তী তাকে 'তুই' সম্বোধন করতেন। প্রভাত চক্রবর্তীকে সে ধমক দিয়ে বলে, "আমি আপনার থেকে অনেক বড়ো, আমাকে 'তুই' 'তুই', বলবেন না।" তার বিকৃতিগুলো ছিল এমন ধরনের যে, অন্যেরা মনে করতো, সে বড়জোর একটু ক্ষ্যাপাটে ধরনের। জেলের মেডিক্যাল অফিসার কিছুতেই বিশ্বাস করেনি যে ধীরেণের মানসিক ভারসাম্যের অভাব ঘটেছে। বড়জোর একটু উদ্ভট ধরনের কথা বলে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। তাকে কিছুদিন হাসপাতালে রাখা হয়েছিল। একদিন মেডিক্যাল অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাকে যে banana দেওয়া হচ্ছে, সেগুলি তোমার খেতে ভাল লাগছে তো?" ধীরেন জবাব দিল, "কই, আমাকে তো banana দেওয়া হয় নি!" যে কয়েদীর উপর রুগীদের পথ্য সরবরাহের দায়িত্ব ছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল, "আমি তো ঠিকই দিয়ে যাচ্ছি।" ধীরেণ তখন জবাব দিল, "আমাকে যা দেওয়া হচ্ছে, তা banana নয়, plain-tain। অবশ্য আমি তো নিতে অস্বীকার করিনি। আমি plaintain হিসাবে গ্রহণ করেছি।"

কর্তৃপক্ষ ধীরেণের ব্যাপারে দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোনওরকম বিবেচনা করতে রাজী হয়নি। ১৯৩৭ সালের অনশনের পর যখন আমাদের মূল ভূখণ্ডের জেলে ফিরে নেওয়ার দাবী গভর্নমেণ্ট মেনে নেয়, তখন প্রথম দলে ধীরেণও দেশের জেলে ফিরে আসে। তাকে দমদম সেণ্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। আমি ঐ জেলে যাওয়ার পর একজন পুরানো বন্ধু এবং সহবন্দী (তিনি আন্দামানে যাননি) দেখা করতে এসে বলেন, "আমরা শুনেছিলাম ধীরেণবাবু পাগল হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি তো কথাবার্তা বলে কিছু টের পেলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করি, "একেবারে কিছুই অস্বাভাবিক ঠেকেনি?" তখন সেই বন্ধুটি জবাব দিল, "আমি কথাবার্তা বলে চলে আসার সময়ে ধীরেণবাবু জানালো, তার সঙ্গে সুইজারল্যাণ্ডে লেনিনের দেখা হয়েছিল।" পরিষ্কার বোঝা যায়, এগুলি তার মনে বহুদিন ধরে সঞ্চিত হীনমন্যতাবোধেরই মানসিক প্রতিক্রিয়া। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, 'Mental Compensation'। দমদম জেলে থাকাকালেই আরেকটি ব্যাপারে বোঝা গেল যে, তার মানসিক ভারসাম্য হারানোর পিছনে শুধু হীন-মন্যতাবোধই নয়, অতৃপ্ত 'যৌনক্ষুধাও যথেষ্ট পরিমাণে কাজ করেছে। সবসময়েই চাদর দিয়ে গা ঢেকে রাখত। স্নান করত না। স্নান না করার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলত, "এখানে কোনও আব্রু নেই।"

রাজশাহীতে যখন একসঙ্গে কাজ করি, তখন ধীরেণের মধ্যে একটা বিরাট বৈপ্লবিক ব্যক্তিত্বের আভাস দেখতে পেয়েছিলাম। সেই সময়টাতে যে কয়েকজন মার্কসবাদের দিকে বলিষ্ঠভাবে ঝুঁকেছিলাম, তাদের মধ্যে সেও ছিল একজন। শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, চিন্তার ক্ষেত্রেও সে ছিল আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ধীরেণকে গভর্নমেণ্ট মুক্তি দেয় ১৯৩৯ সালে। শুনেছি বাইরে যাওয়ার পর সে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটা বিরাট সম্ভাবনার কি মর্মান্তিক অবক্ষয় ঘটল এইভাবে!

অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে সেলুলার জেলের চিকিৎসা ব্যবস্থার কথা, এবং বিশেষভাবে চিকিৎসাবিভাগের একজন সহৃদয় অফিসারের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি সেই সময়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সিনিয়র মেডিক্যাল অফিসার (S. M. O.) ছিলেন। তাঁর নাম বিজেতা চৌধুরী, I. M. S.। তখন ছিলেন ক্যাপ্টেন, পরে আরো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

বৃটিশ আমলে জেলের নিয়মকানুনের বজ্র-আঁটুনির মধ্যে একটা ফস্কা-গেরো ছিল। নিয়মের কড়াকড়ি খানিকটা শিথিল করা হত বন্দীর স্বাস্থ্যের কারণে, চিকিৎসকের সুপারিশে। বিজেতা চৌধুরীর সুপারিশে আমরা একটা বড় সুবিধা পেয়েছিলাম। প্রচণ্ড গরমের মাসগুলিতে "সেল লক-আপ"এর বদলে "করিডর লক-আপ"। সেলের গুমোট থেকে বেরিয়ে এসে করিডরে বসা, ও দরকার হলে ঘুমোনো মস্ত বড় সুবিধা বৈকি! আর একটা ছোট সুবিধাও পেয়েছিলাম তাঁরই সুপারিশে। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীদের গায়ে মাখার সাবান, ও মাথায় মাখার তেল দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা নেই জেলের নিয়মে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বন্দীদের গায়ে মাখার সাবান দেওয়া হত। সেই জায়গায় স্বাস্থ্যের কারণে সকলকেই 'লাইফবয়' সাবান ব্যবহার করতে দেওয়া হত।

জেল হাসপাতালটিতে মামুলী রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। কেউ গুরুতর অসুখে আক্রান্ত হলে তাকে পাঠানো হত "রস আইল্যাণ্ড"এর বড় হাসপাতালে। ব্যাধি গুরুতর, এবং দীর্ঘমেয়াদী হলে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফিরে পাঠানো হত। সাধারণ চক্ষু পরীক্ষা, বা দন্ত পরীক্ষা ইত্যাদির জন্য "রস আইল্যাণ্ড" থেকে মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞকে আনা হত জেল হাসপাতালে। যাদের পরীক্ষা প্রয়োজন, তাদের আগে থেকে নাম দিয়ে আসতে হত। বিশেষজ্ঞ এলে হেড্ জমাদার লালু সিং একটি তালিকায় সংশ্লিষ্ট বন্ধুদের নাম লিখে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরত। কিচেনের ঘন্টি বাজিয়ে হেঁকে হেঁকে বলত, "পি. আই. নং অমুক, পি. আই. নং অমুক, হাসপাতাল মে যাইয়ে। আঁখওয়ালা ডাক্দার, অথবা দাঁতওয়ালা ডাক্দার আয়া হ্যায়।"

আমাদের মধ্যে কাকে কখন কোন্ ওয়ার্ডে পাওয়া যাবে, সেটি ছিল লালু সিং এর নখদর্পণে। লোকটি বহুদিনের পুরানো জমাদার, রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে অভিজ্ঞ। ভদ্র, বিচক্ষণ, অথচ সুচতুর।

হাসপাতালে ডাক্তার ছিল দুজন—সঙ্গত রায়, এবং শিউকুমার। দুজনেই কয়েদী ডাক্তার। সাধারণ বন্দীরা জেলে তিনমাস থাকার পর বাইরে গিয়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পেত। দণ্ডিত হওয়ার আগে সম্ভবতঃ এদের দুজনের কম্পাউণ্ডারী করার অভিজ্ঞতা ছিল। এখানে বাইরের হাসপাতালে ডাক্তারের সহকারী হিসাবে কিছুদিন কাজ করার পর জেল হাসপাতালে নিযুক্ত হয়। সঙ্গত রায় লোকটি যে খারাপ ছিল, তা নয়। তবে সাধারণ বুদ্ধির খুব অভাব। ১৯৩৩ সালে যে তিনজন বন্দী জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টার ফলে মৃত্যুবরণ করেন, সেই-জন্য সঙ্গত রায়ের গাফিলতিই প্রধানত: দায়ী। যে ডাক্তারের শরীরবিদ্যা সম্বন্ধে সামান্য জ্ঞান আছে, সেও জানে, নাকের ভিতর রবারের নল ঢুকিয়ে দুধ ঢালবার আগে দেখে নিতে হয়, নলটা পাকস্থলীর দিকে না গিয়ে ফুসফুসের দিকে গিয়েছে কিনা। পাকস্থলীর দিকে গেলে নলটির দুটি অংশের মধ্যে সংযোগকারী যে কাচের টিউব থাকে, তাতে পেটের গ্যাসের চিহ্ন দেখা যায়। ফুসফুসের মুখে গেলে রোগী ভীষণভাবে কাশতে থাকে। নল দিয়ে দুধ ঢালবার আগে শহীদ তিনজনেরই বিষম কাশি হতে থাকে। তা সত্ত্বেও সঙ্গত রায় দুধ ঢেলে যায়। ফলে নিউমোনিয়া হয়ে তিনজনই দু-একদিনের মধ্যেই মারা যান। শিউকুমার সেই তুলনায় চালাকচতুর।

একজন মেডিক্যাল অফিসার প্রত্যেকদিন সকালে এসে হাসপাতালে রুগীদের দেখে যেতেন। অন্য যেসব বন্দীরা পরীক্ষা করাতে চাইত, তাদেরও দেখতেন। আমরা যে সময় ওখানে যাই, তখন যে ভদ্রলোক মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন, তিনি আমাদের সঙ্গে মোটামুটি ভাল ব্যবহারই করেছেন। তবে হাসপাতালে ঔষধপত্র ছিল মামুলী ধরনের। রোগীদের দেওয়া হত মোষের দুধ। আন্দামানে তখন গরুর দুধ দুষ্প্রাপ্য ছিল। ফল বলতে পেঁপে ও কলা। হাসপাতালে রোগীদের দেখাশুনা করতেন একজন বর্মী কয়েদী। আচরণে মনে হত সে শিক্ষিত, তবে ইংরাজী বেশী না জানায় বর্মী ভাষা ও ভাঙ্গা হিন্দী ব্যবহার করত। ফলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াত, সহজেই অনুমেয়। বক্তব্যের অনেক কিছু ইশারা-ইঙ্গিতেই সারতে হত।

চোখের জন্য "ডার্করুম" পরীক্ষা, বা কোনও অসুখের জন্য "এক্সরে" করতে হলে সংশ্লিষ্ট বন্দীকে লঞ্চে করে নিয়ে যাওয়া হত "রস" হাসপাতালে। পাঁচ নম্বর

ওয়ার্ডের দোতলা থেকে "রস আইল্যাণ্ড" দেখা যেত। পাহাড়ী শহরের ধরনে উপরে নীচে সাজানো সুন্দর ঘরবাড়ি। বাঁধানো রাস্তা সর্পিল গতিতে উপরে উঠেছে। দার্জিলিং শহরের কথা মনে করিয়ে দিত। "রস আইল্যাণ্ড"এ একদিন কিছুক্ষণের জন্য যাওয়ার সুযোগের লোভে কতদিন ভেবেছি, আমার যদি "ডার্ক-রুম" বা "এক্স-রে" পরীক্ষার দরকার হত, তাহলে খুবই ভাল হত।

আমাদের পক্ষে দিনের বেলাটা হাসপাতালে যাওয়া, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, অথবা ডাক্তারের কাছে যাওয়ায় কোনও বিধিনিষেধ ছিল না। এই সুযোগে আমাদের একজন সহবন্দীকে নিয়ে বেশ হাসির খোরাক জুটেছে। তার নাম শম্ভুনাথ আজাদ। উটাকামণ্ড ব্যাংক ডাকাতি মামলায় দীর্ঘমেয়াদে দণ্ডিত। তার একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। হাসপাতালে যে কামরাটিতে বিভিন্ন তাকে ঔষধ সাজানো থাকত, সরাসরি সেখানে চলে যেত। আর কয়েদী কম্পাউণ্ডারকে বলে একসঙ্গে চার-পাঁচ রকমের ঔষধ পান করত। দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া গেল ঃ—

শম্ভুনাথ—"এ কৌন্ দাওয়াই হ্যায় ?"

কম্পাউণ্ডার—"কারমিনেটিভ মিক্সচার"।

শম্ভুনাথ—"ইস্‌সে কেয়া হোতা হ্যায় ?"

(অর্থাৎ এতে কি হয় ?)

কম্পাউণ্ডার—"হজম কা দাওয়াই"

শম্ভুনাথ—"দিজিয়ে তো পি লুঙ্গা" (দিন তো খেয়ে নি।)

শম্ভুনাথ—(আর একটি ঔষধ দেখে)

"এ কৌন্ দাওয়াই হ্যায় ?"

কম্পাউণ্ডার—"সোডিস্যালিসিলাস মিক্সচার।"

শম্ভুনাথ—"ইস্‌সে কেয়া হোতা হ্যায় ?"

কম্পাউণ্ডার—"হাড্ডি কা দর্দ আচ্ছা হোতা হ্যায়।"

(হাড়ের ব্যথার উপশম হয়।)

শম্ভুনাথ—"দিজিয়ে তো পি লুংগা।"

ফলে বন্ধুদের মধ্যে তার নামকরণ হয়ে গেল, 'দিজিয়ে তো পি লুংগা'। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা ডাকত, "কেয়া রে ভাই দিজিয়ে তো পি লুংগা" ?

চোখ পরীক্ষা শেষ পর্যন্ত আমারও হয়েছিল। তবে "রস" হাসপাতালে যাওয়ার সুযোগ হয় নি। বিশেষজ্ঞ যিনি এসেছিলেন, তিনি চশমা দিলেন, এবং জানালেন যে, আমার পক্ষে "ডার্করুম" পরীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই। চক্ষু পরীক্ষার প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। তখন যে ভদ্রলোক সেলুলার

জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন, তাঁর কথা। প্রথমবারের অনশনের সময়ে যাঁরা সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং জেলার ছিলেন, তাঁরা অনেক আগেই বদলী হয়ে গিয়েছেন। তদানীন্তন জেলার 'বেল্' সাহেবের বিরুদ্ধেই রাজনৈতিক বন্দীদের সমস্ত অভিযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। ভারত সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে বন্দীদের আপোষ মীমাংসা, এবং অনশন ভঙ্গের অল্প দিনের মধ্যেই বেল্ সাহেবকে বদলী করা হয়। সুপারিন্টেন্ডেন্টের বদলী তারপর। আমি যখন ওখানে, তখন তাঁর বা জেলারের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সংস্রবে আসার কোনও অবকাশ ঘটে নি। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যা কিছু কথাবার্তা বলার, আমাদের প্রতিনিধিরাই বলতেন। সুপারিন্টেন্ডেন্ট এবং জেলারের দেখা মিলত সাপ্তাহিক পরিদর্শনের সময়ে। সিপাই-সান্ত্রী পরিবেষ্টিত হয়ে একতলার 'করিডোর দিয়ে ঘুরে যেতেন। আমাদের দাঁড়াতে হত সেলের দরজায় ব্যক্তিগত কোনও অভিযোগ অনুরোধ থাকলে এটিই ছিল বলার সময়। সুপারিন্টেন্ডেন্ট লোকটি ইংরেজ, না অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সেকথা ঠিক মনে নেই। তবে ভদ্রলোক যে লেখাপড়া জিনিষটিকে কাজ বলে মনে করতেন না, সেটুকু পরিচয় পেয়েছি। আমার চোখ পরীক্ষার প্রয়োজনের কথা জানাতে জানতে চাইলেন, অসুবিধা কি হয়। আমি জানালাম, কিছুক্ষণ পড়া বা লেখার পর চোখ টন্‌টন্ করে ও মাথা ধরে। ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "লেখাপড়া করার দরকারটা কি? অসুবিধা হলে না করাই ভাল।" জেলারটি ইংরেজ। মনে হয় বিচক্ষণ এবং সুচতুর। পরিবর্তিত অবস্থায় রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করতে হয়, তা ভালভাবেই জানতেন। তবে সুযোগ পেলেই যে ছোবল দিতে ছাড়বেন না, সেটা বোঝা গেল আমাদের সেলুলার জেলের জীবনের একেবারে শেষপর্বে, একটি ঘটনায়। সে বিষয়ে যথাস্থানে বলা হবে।

কারাগার তো শুধু লৌহকপাট, এবং পাষাণবেদী নয় সময়ের বোঝাটাও অত্যন্ত ভারী। নিস্তরঙ্গ মন্থর ছন্দ দিনগুলি। একটির সঙ্গে আরেকটির কোনও তফাৎ নেই। কালের গতি থেমে থাকে না বলেই দিন যায়, মাস যায়, বছর অতিক্রান্ত হয়। সহবন্দী যারা একসঙ্গে বহুদিন রয়েছি, সবারই যে বয়স বেড়েছে, সেকথাটি কারো মনে থাকে না। কথা আছে, জেলখানায় কয়েদীর বয়স বাড়ে না। ভর্তি হওয়ার সময় সরকারী খাতায় যে বয়স লেখা থাকে, মুক্তিলাভের দিনটিতেও সেটিই ধরা হয়। এহেন পরিবেশে অত্যন্ত ছোটখাটো তুচ্ছ ঘটনাও বৈচিত্র্যের খোরাক যোগায়।

আন্দামানে সব্জী বলতে পাওয়া যেত কাঁচাকলা ও একরকমের ডাঁটা। কুমড়ো, বেগুন, আলু প্রভৃতি জাহাজে করে মূল ভূখণ্ড থেকে আমদানী হত। জাহাজ

আসার কয়েকদিন পর কর্তৃপক্ষ গুদাম থেকে একমাসের বরাদ্দ আমাদের কিচেনের তত্ত্বাবধায়কদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁরা ঘণ্টি বাজিয়ে বন্ধুদের খবর জানাতেন, "দেশ থেকে শক্ত সব্জী এসেছে, আপনারা দেখে যান।" আমাদের সরবরাহ করা হত সামুদ্রিক মাছ। একবার একটা পাঁচ-ছয় ফুট লম্বা সামুদ্রিক মাছ এসেছিল। আরেকদিন একটা প্রকাণ্ড কাছিম। তখনও ঘণ্টি বাজিয়ে সবাইকে ডাকা হয়েছিল।

প্রতিবাদী ভয়ংকর আচারিয়াকে স্বাস্থ্যের কারণে ফাইফরমাস খাটার জন্য কিছুদিন একজন সাধারণ কয়েদী দেওয়া হয়েছিল। সেই লোকটি জেলের নিয়মে তিনমাস পরে বাইরে যায়, এবং তাকে জঙ্গলে গাছ কাটার কাজে নিযুক্ত করা হয়। একদিন খবর আসে, সেই লোকটিকে জংলীদের বিষাক্ত তীরে প্রাণ হারাতে হয়েছে। খবরটা শুনে আচারিয়া দুঃখ করে বলে, "আহা! লোকটি তেলুগু ভাষার একটি শব্দও জানত না!" আমি হেসে বলি, "তেলুগু জানলেই কি আর বিষাক্ত তীরের হাত থেকে রক্ষা পেত!"

সাধারণ কয়েদীরা থাকত সাত নম্বর, এবং চার নম্বর ওয়ার্ডে। এদের মধ্যে পাঠান, তামিল ভাষী এবং বর্মীরাই ছিল বেশী। সেই সময়ে ব্রহ্মদেশ বৃটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাঠান এবং বর্মীদের মধ্যে মারামারি লেগেই থাকত। চার নম্বর ওয়ার্ডটি পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের খুব কাছাকাছি। ফলে মারামারির দৃশ্যও মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে। পাঠানরা লম্বা চওড়া, জোয়ান, আস্ফালনও বেশী। বর্মীরা সম্মুখযুদ্ধে পেরে উঠত না। কিন্তু তারা ছিল নীরব কর্মী। যার উপর রাগ আছে, সেই লোকটি যখন দৈনিক 'খাটুনী' নিয়ে ব্যস্ত, সেই সময়ে পিছন থেকে ছোবড়া পিটানো কাঠের মুগুর তার মাথায় বসিয়ে দিত। শুনেছি, হত্যার অপরাধে দু-একজনের ফাঁসীও হয়েছে।

দেশের জেলে তবু ঋতুপরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। বসন্তে জেলের আঙিনার গাছগুলিও নতুন পাতার সমারোহে সেজে ওঠে। শরতের আকাশ মনে দোলা দিয়ে যায়। আন্দামানে ঋতু বলতে প্রধানতঃ দুটি—গ্রীষ্ম ও বর্ষা। প্রায় সাত/আটমাস বৃষ্টি হয়। আকাশে যখন মেঘ জমে, তখন গুমোট এক একদিন দুঃসহ হয়ে ওঠে। শরৎ বা শীত বলে কিছু নেই। ওখানে বন্দীদের কম্বল বা গরমজামা দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসে সকাল পাঁচটার পর ঠাণ্ডা জলে স্নান করেছি। খুব বৃষ্টি হলে বিছানার চাদর গায়ে দিয়েই চলে গিয়েছে। গরমের সময় জলাধারগুলিতে সংরক্ষিত জল প্রায় তলায় গিয়ে ঠেকত। স্নান এবং পানের জন্য ঐ জলই সরবরাহ করা হত।

শুনেছি একটিমাত্র পাহাড়ী ঝরনা আছে। তার জল উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদের জন্য সংরক্ষিত। ফলে গরমকালে যে জল আসত, তার চেহারা ঘোলাটে। পানের জন্য ঘটিতে জল রাখলে পুরু তলানী পড়ে যেত। স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়াটা আর আশ্চর্য কি! বাঁকুড়ার ভবতোষ কর্মকারের একটি মন্তব্য আমাদের মুখে মুখে ঘুরত। ভবতোষবাবু মানুষটি ছিলেন খুবই সাদাসিধে, সদা হাসিখুশী। ওখানে তিনি কোনও রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গেই সম্পর্ক রাখতেন না। হাতের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত, "ভবতোষদা, কেমন আছেন?" তিনি একগাল হেসে বলতেন, "ভালো আর কি করে থাকব বলুন। এখানে 'লয়' শীত, 'লয়' গ্রীষ্ম। অর্থাৎ না শীত, না গ্রীষ্ম।"

স্মৃতির গহনে হাতড়ে অনেক টুকরো খবর হয়ত উদ্ধার করা যায়, তবে সেগুলি অনুক্ত থেকে গেলে ক্ষতি নেই। তার চাইতে বরং ঐতিহাসিক তাৎপর্যে ভরা শেষের দিনগুলির কথাই বিশদভাবে বলা যাক।

আমরা সেলুলার জেলে যাওয়ার আগেই ওখানকার বন্ধুরা দেশে ফেরার দাবীতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। ভারত সরকারের কাছে কয়েকটি স্মারকপত্র পেশ করা হয়ে গিয়েছে। দেশে ফেরার তাগিদের পিছনে দুটি কারণ ছিল। একটি স্বাস্থ্যজনিত, আর একটি রাজনৈতিক। রাজনৈতিক কারণটির কথা যথাসময়ে বলা যাবে।

ওখানকার আবহাওয়া সম্বন্ধে যতটুকু চিত্র দিয়েছি, তাতে স্বাস্থ্যের উপর কিরকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে, বোঝা কঠিন নয়। পেটের নানারকম অসুখ, হজমের গোলমাল, খুশখুশে কাশি ইত্যাদিতে অনেককে প্রায় সারা বছর ভুগতে হত। মনে রাখতে হবে, তখন আমাদের বেশীরভাগের বয়স বিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। ত্রিশের কোঠার মাঝামাঝি ছিলেন মাত্র কয়েকজন—ডাঃ নারায়ণ রায়, ডাঃ ভূপাল বসু, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, রাধাবল্লভ গোপ। আরও দু-একজন থাকতে পারেন। তাঁদের নামটা এখন মনে পড়ছে না। কেউ কেউ ভিতরে ভিতরে কিরকম ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিলেন, তার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। চট্টগ্রামের ফণী নন্দী তাগড়া জোয়ান ছেলে। হঠাৎ একদিন ফুটবল খেলার মাঠে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল। হাসপাতালে নেওয়ার পর দেখা গেল, মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে রক্ত বেরোচ্ছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, "গ্যালপিং টি. বি.।" ফণী নন্দীকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। হার্টের অসুখ বেশ কয়েকজনের ছিলো।

রাজনৈতিক কারণ হলো, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্নতা সম্বন্ধে ধারণা। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যতটুকু খবরাখবর আমরা পেতাম, তা থেকে একটা

জিনিষ পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল। বিশ্বের উপরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। যদি যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পরও আমাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বারোশ' মাইল দূরে নির্বাসনে দ্বীপে বন্দী অবস্থায় কাটাতে হয়, তাহলে অবস্থাটা মোটেই সুবিধাজনক হবে না। সুতরাং তার আগেই দেশে ফিরতে হবে।

আমাদের পক্ষ থেকে যেসব স্মারকলিপি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তার অনুলিপি (কপি) নানা কৌশলে দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে পেঁাছে দেওয়ার ব্যবস্থাও হয়েছিল। তখনকার দিনের কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য দলের প্রতিনিধিরা আমাদের দেশে ফিরিয়ে আনার দাবীতে মুখর হয়ে ওঠেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে পড়ে মাদ্রাজের শ্রী ওয়াই, ডি, সত্যমূর্তি'র কথা, তিনি ছিলেন দক্ষ সংসদবিদ। তীক্ষ্ণযুক্তি, প্রত্যুৎপন্নমতি। ক্ষুরধার প্রশ্নবানে সরকার পক্ষের প্রতিনিধিদের বিব্রত করে তোলায় তাঁর জুড়ি ছিল না। নতুন শাসন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বমুহূর্তে গভর্নমেন্টের পক্ষে স্বরাজ্য দলের বক্তব্যকে একেবারে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিলো না। তবে বৃটিশ গভর্নমেন্টের কৌশল ছিল, শেষ পর্যন্ত যা করতেই হবে, তাকে একটু একটু মুঠো আলগা করে ধীরে ধীরে সেদিকে এগোনো। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নারায়ণস্বামী নামে একজন বে-সরকারী, অথচ মনোনীত সদস্যকে সেলুলার জেল পরিদর্শনে পাঠানো হল। ভদ্রলোক এসেছিলেন আমি যাওয়ার আগে। শুনেছি বিপ্লবী বন্দীদের সম্বন্ধে ভদ্রলোকের এমনি আতঙ্ক ছিল যে, তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করা দূরে থাকুক, ওয়ার্ডের ভিতরে পা দেননি। "সেন্ট্রাল টাওয়ার" এ উঠে প্রত্যেক ওয়ার্ডের তিন-তলার ছাদের উপর দিয়ে ঘুরে গিয়েছিলেন। ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, "বিপ্লবী বন্দীরা সুখেই আছে। আন্দামান বন্দীদের স্বর্গ" (Prisoners' Paradise)। সত্যমূর্তি তার জবাবে বহু তথ্যের ভিত্তিতে ঐ বক্তব্য খণ্ডনের পর মন্তব্য করেন, "আন্দামান বন্দীদের নরক।" (Prisoners Hell)

এরপর আসেন শুনেছি ভারতসরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্য স্যার হেনরী ক্রেইক। ইনি খাঁটি ইংরেজ। বিপ্লবীদের ভয় পান, এমনভাব ঘুণাক্ষরেও যাতে কেউ টের না পায়, সেদিকে খুব সতর্ক। ইনি প্রত্যেক ওয়ার্ডেই ঢুকেছিলেন। তবে করিডোরে নয়। করিডোরের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে আমাদের যে কয়েকজন বন্ধুকে সামনে পেয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে দুই-একটা কথা বলেছেন। বলা বাহুল্য, তিনি সিপাহী-সান্ত্রী-দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত ছিলেন। কথাবার্তা বলেন গরাদের ওপার থেকে। ছয় নম্বর ওয়ার্ডে করিডোরের ভিতরে প্রবেশ পথের সামনেই ছিলেন গয়া ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দণ্ডিত শ্যাম ভতুয়া। হেনরী ক্রেইক

তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেন। শ্যাম ভতুঁয়া যথারীতি নামও বলেন। তবু মাননীয় স্বরাষ্ট্র সদস্য বারবারই জিজ্ঞাসা করে চলেন, "আপনার নাম কি?" তাঁর গলার স্বরে বুকের কাঁপুনি বন্ধুদের কানে ঠিকই ধরা পড়েছিল।

আমি ওখানে যাওয়ার পরে আসেন বাংলার প্রবল প্রতাপান্বিত কুখ্যাত গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসন। ইনি ১৯৩৪ সালে দম্ভের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, "যতদিন পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদীদের মুখের সামনে দেশের প্রতিটি ঘরের দরজা বন্ধ না হবে, যতদিন দেশের প্রত্যেকটি লোক তাদের দিকে আঙুল দিয়ে না দেখাবে, ততদিন তাদের মুক্তির কোন প্রশ্নই আসে না।" স্যার জন অ্যান্ডারসনের সময়ে সরকারী মহল থেকে একটা তত্ত্ব উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছিল—"বেকার সমস্যাই তরুণদের বিপ্লবী দলে টেনে আনে।" তদনুযায়ী তিনি একটা পরিকল্পনা করেছিলেন। বিনাবিচারে আটক বন্দীদের নানারকম হাতের কাজ শেখানো হবে। যথা—ছাতা তৈরী, সাবান তৈরী ইত্যাদি। যেসব বন্দী সেই সুযোগ নিতে চায়, তাদের জন্য 'ক্যাম্প জেল' করা হয়। সেখানে কড়াকড়ি বেশ কিছুটা শিথিলও করা হয়। খুব অল্প কয়েকজন আটক বন্দী সেই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। বেশীরভাগই প্রত্যাখ্যান করেন। অ্যান্ডারসন সেলুলার জেল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন ঐরকমই একটা পরিকল্পনা নিয়ে। তিনি অবশ্য সিপাহী-সান্ত্রী-দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রত্যেক ওয়ার্ডে ঢুকে করিডোরের লোহার গরাদের ওপারে একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসেন। আমাদের কারো কারো সঙ্গে কথাও বলেন। আমাদের তরফ থেকে একটা স্মারকলিপি তৈরী করে রাখা হয়েছিল। প্রত্যেক ওয়ার্ডে আমাদের প্রতিনিধিরা সেকথা জানানোয় তিনি গম্ভীর গলায় জবাব দিলেন, "আমি শুনেছি।" তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, ভদ্রলোকের প্রতি পদক্ষেপে, গলার আওয়াজে ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য পরিস্ফুট ছিল।

অ্যান্ডারসন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব ছিল। যথা—সমুদ্রে স্নান করা, জেলের বাইরের মাঠে খেলাধুলার ব্যবস্থা, বাইরে 'ক্যাম্প জেল' এ গিয়ে কাজ শেখা ইত্যাদি। তাঁর ধারণা ছিল, এতেই আমরা ভুলে থাকবো। ভুলিনি সেকথা বলার দরকার হয় না।

এর পরে সেলুলার জেল পরিদর্শনে আসেন স্বরাজ্য দলের রায়জাদা হংসরাজ, এবং মুশ্লীম লীগের স্যার ইয়ামিন খাঁ। এঁরা প্রত্যেক ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন। পরে জেল অফিসে আমাদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠান এবং খুব খোলা মনেই কথাবার্তা বলেন। দুজনেই পাঞ্জাবী। কথাবার্তা অবশ্য রায়জাদা হংসরাজই বেশী

বলেন। তখনই তিনি আমাদের দাদুর বয়সী। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে হাসি-ঠাট্টাও হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলি—১৯৫২ সালে আমি যখন রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়ে যাই, তখন তিনি ঐ সভারই কংগ্রেস সদস্য। বয়স অনেক হয়েছে, তবু নুয়ে পড়েন নি। আমার সেল্লার জেলের সহবন্দী ধন্বন্তরিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন রায়জাদার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁর পত্নীও উপস্থিত ছিলেন। দাদু-দিদিমা যেরকমভাবে নাতিকে সাদরে কাছে টেনে নেয়, ঠিক সেইরকম প্রাণখোলা ব্যবহার পেয়েছিলাম।

দেশে প্রত্যাবর্তনের দাবীতে আমাদের আরো সক্রিয় হয়ে ওঠার সূচনা হয় ১৯৩৭ সালের গোড়ার দিক থেকেই। রায়জাদা হংসরাজ কেন্দ্রীয় আইনসভায় পুরোপুরি আমাদের অনুকূলেই রিপোর্ট দান করেন। স্বরাজ্য দলও রিপোর্টটি কাজে লাগাতে কসুর করে নি।

ইতিমধ্যে সেল্লার জেলে আসেন সর্দার গুরুমুখ সিং। গুরুমুখ সিং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় (ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ সংগঠনের প্রচেষ্টা) যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, এবং সেল্লার জেলে প্রেরিত হন। সেই অধ্যায়ে কর্তৃপক্ষের অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে যাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ করে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ইনি ছিলেন একজন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকবছর পর ভারতসরকার সেল্লার জেল থেকে সমস্ত দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীকে মূল ভূখণ্ডের জেলগুলিতে ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে। সেইসব বন্দীদের মধ্যে গুরুমুখ সিংও একজন। এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তরের সময়ে পলায়ন করতে সমর্থ হন। তারপর আত্মগোপন অবস্থায় কাবুলের পথে পাড়ি দিয়ে শেষপর্যন্ত মস্কো পৌঁছান। মস্কোতে প্রাচ্যের মেহনতী জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করেন। আবার আত্মগোপনকারী অবস্থায়ই দেশে ফিরে এসে পাঞ্জাবে কৃষক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে একজন সহকর্মীর বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁকে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়। তখন দণ্ডের মেয়াদের বাকী সময়টুকু পূর্ণ করার জন্য তাঁকে আবার সেল্লার জেলে পাঠানো হয়। যে পুলিশ অফিসারটি আন্দামানে আসার সময়ে প্রহরীদের দায়িত্বে ছিল, সে শাসিয়ে বলে, সর্দারজী। এবার আর আন্দামান থেকে ফিরতে হবে না। আপনার চিতাভস্ম সাগরের জলে মিশে যাবে।" জবাবে গুরুমুখ সিং বলেন, "ফিরে তো আসবই, ছ'মাসের মধ্যে। শুধু আমি একলা নই। ওখানে আমার বন্ধুরা যারা আছে, তাদের সকলকে সঙ্গে নিয়ে। আর ফিরব বীরের সম্মান নিয়ে।"

গুরুমুখ সিংএর বিরাট বিপ্লবী ঐতিহ্য, বিপুল অভিজ্ঞতা স্বভাবতঃই তাঁকে

সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কর্মীদের শ্রদ্ধাভাজন করে তোলে। প্রত্যেক দলের নেতারাই তাঁর সংগে আলাপ-আলোচনা করেন। মানুষটি ছিলেন খুবই সাদা-সিধে। কৃষক পরিবারের ছেলে। ইংরাজী বেশী জানতেন না। তবে বাস্তব অভিজ্ঞতা, এবং রাজনৈতিক বিচক্ষণতা যথেষ্টই ছিল। বলিষ্ঠ দেহ এই মানুষটি ৬০ বৎসর বয়সেও "লং জাম্প" প্রতিযোগিতায় সকলকে হারিয়ে দিয়ে প্রথম হন। পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত হালুয়া খুব আনন্দের সংগেই ভক্ষণ করেন। মেলামেশায় সকলের সংগেই সমান আচরণ। হাসিখুশী, অথচ কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে অটল, অবিচল।

কিছুদিন পর গুরুমুখ সিং সকল দলের নেতাদের কাছে একটা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তিনি বলেন, "খুব শীঘ্রই নতুন শাসনসংস্কার আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক বিধানসভাগুলির জন্য নির্বাচন হবে। বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করবে। যেসব প্রদেশে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রি-সভা হবে, সেখানেও তাদের পক্ষে জনমতকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হবে না। বৃটিশ শাসনের বজ্রমুষ্টি সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা শিথিল হয়েছে। এই সময়ে যদি আমরা রাজনৈতিক দাবীতে অনশন শুরু করি, তাহলে সারা দেশের জনমত আমাদের স্বপক্ষে উত্তাল হয়ে উঠবে। আমরাও দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটা নতুন মোড় দিতে সমর্থ হব।"

প্রস্তাবটি নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে সমস্ত রাজনৈতিক দলের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, চিন্তাভাবনা চলে। সর্দারজীর যুক্তিগুলি মোক্ষম, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্যদিকে এমন কয়েকটি ব্যবহারিক দিক আছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না। যথা—দেশের জাতীয়তাবাদী, বিশেষতঃ বামপন্থী মহলে সময়মতো খবর পৌঁছানো। তাঁদের প্রস্তুতির জন্যও কিছু সময় দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমবারের অনশনের সময়ে কয়েকজনের শহীদ হওয়ার পরে কোনওমতে দেশে খবর পৌঁছায়। সেবারকার অনশন ছিল স্থানীয় দাবীতে। যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, জেলজীবনের নারকীয় পরিস্থিতির অবসান একভাবে না একভাবে করতেই হবে। হয় জয়লাভ, নতুবা মৃত্যু। অত্যন্ত রূঢ় পরিস্থিতি তাঁদের মরিয়া করে তুলেছিল। এবারকার অনশন সংগ্রাম হবে একেবারে ভারতসরকারের নীতিকে চালেঞ্জ করে। গভর্ণমেণ্ট সহজে নতিস্বীকার করতে চাইবে না। শান্তভাবে সমস্ত দিক বিবেচনা করে, সবরকম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হয়ে সংগ্রামে নামতে হবে। হয়তো বেশ কয়েকজনকে আত্মদান করতে হতে পারে। সর্বদিক খুঁটিনাটি আলোচনার পর অনশন করাই সকল দলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হলো। দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপঃ—

(১) সমস্ত দমনমূলক আইন প্রত্যাহার।

(২) বিনাবিচারে আটক, এবং দণ্ডিত সব রকম রাজনৈতিক বন্দীর বিনা শর্তে মুক্তি।

(৩) মুক্তিসাপেক্ষে দেশের জেলে নিজ নিজ প্রদেশে ফিরিয়ে নেওয়া (repatriation).

(৪) মুক্তিসাপেক্ষে সকলকে রাজনৈতিক বন্দীদের উপযুক্ত মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা সহ একই শ্রেণীভুক্ত করা (Uniform Classification).

যথারীতি স্মারকপত্র ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হলো। যেসব বন্ধুদের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, তাঁদের মারফৎ স্মারকপত্রের অনুলিপি পাঠানোর ব্যবস্থা হলো। আন্দামান থেকে ফিরে আসার পর বন্দীদের রাখা হতো আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে। সেখানে স্বল্পমেয়াদে দণ্ডিত অন্যান্য দল ও মতের রাজনৈতিক কর্মীরাও ছিলেন। বিনাবিচারে আটক বন্দীদেরও চিকিৎসার জন্য ঐ জেলেই আনা হতো। বাইরে থেকে আত্মীয়স্বজন দেখা করতে আসতেন। গুরুতরভাবে অসুস্থ বন্দীদের বাইরের হাসপাতালে পাঠানো হত। তাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল ছিল আমাদের খবরাখবর বিনিময়ের তথা যোগাযোগের একটা বড় কেন্দ্র।

স্মারকপত্র পাঠানোর পর অনশনের প্রাথমিক প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। অনশন শুরু হলে কয়েকদিন পর জেল-কর্তৃপক্ষ জোর করে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। অনশনব্রতীর হাত-পা-মাথা কয়েকজন চেপে ধরে নাকে রবারের নল ঢুকিয়ে দুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়। আলোচনার পর ঠিক হলো, আমরা গণ-অনশন, অর্থাৎ একসঙ্গে যত বেশী সংখ্যক সম্ভব, অনশনে নামবো। আন্দামানের তখন যা অবস্থা ছিলো, তাতে বহুসংখ্যক বন্দীকে জোর করে খাওয়ানোর বন্দোবস্ত করা অসম্ভব ছিল। ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার, দুধ, সবকিছুই সমস্ত দ্বীপ থেকে সংগ্রহ করে যা পাওয়া যাবে, তা কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। উপরন্তু, আমরা জোর করে খাওয়ানোর প্রচেষ্টাকে যতক্ষণ সম্ভব প্রতিরোধ করবো। উদ্দেশ্য হলো, সকলকে খাওয়ানোর সময়কে যতদূর সম্ভব দীর্ঘায়িত করা। আমাদের হিসেব, এতে জেল-কর্তৃপক্ষের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়বে। ফলে তারা ভারত সরকারের উপর চাপ দিতে বাধ্য হবে।

আমাদের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক ছিলেন, যাঁদের অনশন সংগ্রামের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। আবার অনেকেরই এই প্রথম অভিজ্ঞতা। নতুনদের মনে আশংকা বা ভীতি ছিল না তা নয়, তবে সে ভীতিটা অন্য ধরনের। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের মধ্যে একটা কথা প্রচলিত হয়েছিল, "Fear of fear (ভয়ের ভয়),

অর্থাৎ, 'শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবো তো !' 'হার মানতে হবে না তো !' এই ধরনের ভীতি মনকে দুর্বল করে না। বরং দৃঢ় করে তোলে। কিছুতেই মাথা নোয়াবো না। এই সংকল্প তিলে তিলে শক্তিসঞ্চয় করে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে আলোচনার পর তিন নম্বর ওয়ার্ডের খাওয়ার হলে সকলের সাধারণ সভা ডাকা হলো। সেখানে অভিজ্ঞ বন্ধুরা পূর্ববর্তী অনশন সংগ্রামগুলির ধরনধারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিলেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরা, অর্থাৎ সর্দার ভগৎ সিংএর সহকর্মীরা বিচারাধীন অবস্থাতেই বেশ কয়েকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য অনশন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯২৯ সালে লাহোর জেলে যতীন দাসের দুই মাসের বেশী সময়ের পর মৃত্যুবরণ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। শহীদের আত্মবলিদানের ঘটনায় সারাদেশে যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল, তা স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন জোয়ারের সূচনা করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞতার বিবরণ দিলেন বটুকেশ্বর দত্ত। কিভাবে জোর করে খাওয়াবার চেষ্টাকে প্রতিরোধ করতে হয়, তার কয়েকটি কৌশল তিনি বর্ণনা করেন। সেলুলার জেলে প্রথমবারের অনশনে অংশগ্রহণকারীদের কয়েকজনও তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

এ এক নতুন ধরনের লড়াই। বিচিত্র লড়াই। এ সংগ্রাম শুধু কর্তৃপক্ষের সংগে নয়, এ সংগ্রাম নিজের দেহের সঙ্গে মনের। প্রতিদিন, প্রায় প্রতিটি মুহূর্তে। কর্তৃপক্ষের চেষ্টা হবে আমাদের বাঁচিয়ে রাখা। আমাদের প্রচেষ্টা হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংকট সৃষ্টি করা।

কিছুদিন পর ভারত সরকারের পক্ষ থেকে স্মারকলিপির জবাব এল। নিয়ে এলেন চীফ কমিশনার কস্‌গ্রেভ্ (Cosgrave) সাহেব নিজে। আমাদের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠালেন। জানালেন, "আমার কাজ আপনাদের বক্তব্য উপরে পাঠিয়ে দেওয়া, উপরের জবাব আপনাদের কাছে পেঁাছে দেওয়া।" গভর্নমেণ্টের চিঠিটিতে সঠিক কি কি ছিল, তা জানি না। তার সারমর্ম নিম্নরূপ :—

"তোমাদের প্রথম দুটি দাবী গভর্নমেণ্টের নীতির সংগে সম্পর্কিত। এবিষয়ে বন্দীদের কোনও কথা বলার অধিকার নেই। দেশে ফেরার ব্যাপারে তোমরা ভাল আচরণের দ্বারা বেশী করে 'রেমিশন' অর্জন করো। সেই অনুসারে দণ্ডের মেয়াদ হ্রাস হবে। বন্দীদের প্রত্যেকের পারিবারিক সম্মান, জীবনযাত্রার স্তর, শিক্ষাগত মান বিচার করে যারা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্য বিবেচিত হয়েছে, তাদের তাই করা হয়েছে। এবিষয়ে নতুন কিছু করার নেই।"

জেলের নিয়মে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের সাধারণতঃ মাসে চারদিন,

প্রত্যেক রবিবার হিসেব করে 'রেমিশন' দেওয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ দণ্ডের মেয়াদ থেকে প্রতিমাসে চারদিন মকুব করা হত। এক বছর কারো বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না এলে পনেরো দিন 'নো কেস রেমিশন' দেওয়া হতো। জেল আইন ভঙ্গের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাগুলির একটি ছিল 'রেমিশন' কাটা। যারা বিশেষ বিশেষ ধরনের কাজে নিযুক্ত হতো, যেমন—জেল অফিসে কেরাণীর কাজ, কিচেন পরিচালনা, ইত্যাদির জন্য আরো বেশী 'রেমিশন' দেওয়া হতো।

গভর্নমেণ্টের জবাব আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল না। সামনের পদক্ষেপ চরমপত্র দিয়ে অনশন শুরু করা। আলোচনার পর ঠিক হয়, চরমপত্র দেওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে দুদিনের বেশী সময় দেওয়া হবে না। সময় দিলে তাদের পক্ষের প্রস্তুতির কাজে সাহায্য হবে।

যারা গুরুতরভাবে অসুস্থ ছিল, তাদের অনশন থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। আর কয়েকজনকে যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হলো।

অনশন শুরু হওয়ার একদিন আগের রাত্রে আমরা 'জোলাপ' দিয়ে নিলাম। অভিজ্ঞ বন্ধুদের পরামর্শেই এটা করা হয়েছিল। পেটে কোনরকম খাদ্য না পড়লে কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়। সেটা খুব যন্ত্রণাদায়ক হতে পারে। তাই সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা। ঐদিনই সন্ধ্যায় চরমপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হলো কর্তৃপক্ষের কাছে। 'কিচেন' পরিচালনার দায়িত্ব তখনও আমাদের হাতে। পরের দিন দুবেলা সকলের জন্য নরম সহজপাচ্য খাদ্যের ব্যবস্থা হলো।

সঠিক সংখ্যা মনে নেই। সম্ভবতঃ দু'শর কাছাকাছি জনেরও বেশী একই দিনে অনশন শুরু করি। শুনেছি, জেলখানায় এত বড় গণ-অনশন এই প্রথম। জেল-কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, অনশনব্রতীদের দুই নম্বর, এবং তিন নম্বর ওয়ার্ডের দোতলা এবং তেতলায় রাখা হবে। আমরা ইচ্ছে করলে আগেই সে ব্যবস্থা করে নিতে পারি। আমাদের পক্ষেও তাই সুবিধা। যে যার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে পাশাপাশি থাকা যাবে।

আমার স্থান হলো তিন নম্বরের দোতলায়। সেখানে অন্য যাঁরা ছিলেন, সবার নাম মনে নেই। যতদূর মনে আছে, জিতেন গুপ্ত, প্রভাত চক্রবর্তী, প্রভাত মিত্র, অমূল্য সেন, সর্দার গুরুমুখ সিং, খুশীরাম মেটা ও হাজারা সিং একত্রে ছিলাম। যারা অনশনে যোগ দেয়নি, তারা থাকবে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে।

সেই রাতটা সেল্ লক্-আপ হতে বেশ দেরী হলো। সান্ত্রীরা বিরক্ত হয়ে বলে, "আগামীকাল থেকে মজা টের পাবে।" জেলের নিয়মে, ৪৮ ঘন্টা অতীত

না হলে সরকারীভাবে অনশন বলে স্বীকৃত হয় না। অনশন ধর্মঘট জেলের নিয়মে অপরাধ। আগের রাত্রেই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিল, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের সমস্ত সুবিধা স্থগিত রাখা হলো। পরের দিন স্নান করার জন্য এক-একজন করে সেলের তালা খোলে। করিডোরেরই এক কোণে জলের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে সকলের স্নান হতে বিকেল গড়িয়ে এল। পরের দিনও ঐভাবেই চলে। ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সাধারণ নিয়ম প্রতিদিন প্রতিটি সেলে খাদ্য ঢেকে রাখা। আমরা গোপনে খেয়েছি কিনা, এটাই পরীক্ষা করা হয়। এবারে অবশ্য এতগুলি লোকের জন্যে ঐরকম ব্যবস্থা করা কর্তৃপক্ষের সাধ্যে কুলোয় নি। দুদিন কেটে যাওয়ার পর দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে চিকিৎসাবিভাগের হাতে। বিজেতা চৌধুরী দায়িত্ব নিয়েই নির্দেশ দিলেন, দিনের বেলায় সবাইকে করিডোরে থাকতে দিতে হবে। গল্পগুজব করার সুযোগ দিতে হবে। এমনকি দুর্বল শরীর যাদের, তারা প্রয়োজনে, ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে গরম জলও পেতে পারে। জল বয়ে নিয়ে আসত কয়েকজন তামিলভাষী সাধারণ কয়েদী। তাদের ভাষা না বুঝলেও দু একদিনের মধ্যে বোঝা গেল, "সুরুতানি" হলো ঠাণ্ডা জল, আর "পচতানি" গরম জল। পরিভাষার ভাণ্ডারে দুটি নতুন শব্দ সংযোজিত হলো। বর্মী ভাষার দুটি কথা আগেই শিখেছিলাম—"মসিবু" আর "মালোমা"। "মসিবু" অর্থ 'নাই'। "মলোমা" শব্দটি প্রায়ই শোনা যেত বর্মী ভাণ্ডারীটির মুখে। অর্থ না বোঝা গেলেও তা যে শ্রুতিসুখকর নয়, এমনকি ছাপার অক্ষরে প্রকাশের যোগ্যও নয়, সেকথা বুঝতে বাকী থাকে না।

তিন নম্বর ওয়ার্ডের তেতলা ও দোতলা থেকে চোখে পড়ে একটি নয়নাভিরাম দৃশ্য। ঠিক সামনেই সবুজ বনে ঢাকা 'মাউন্ট হেরিয়ট'। অ্যাবার্ডীন দ্বীপ, ও মাউন্ট হেরিয়টের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে সাগরের বুক থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়। তাদের বাহুগুলির কোনটি সমান্তরালভাবে, কোনটি অর্ধচন্দ্রের আকারে সাগরের ভিতরে ঠেলে এসেছে। "ফোনিক্স বে"র গতি ঐখানেই রুদ্ধ হয়েছে। জাহাজ এলে ঐরকম একটি জায়গায় নোঙর করে রাখা হত। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হত, যেন কোনও মায়াবী মঞ্চশিল্পী এক অপরূপ প্রেক্ষাপট রচনা করে রেখেছে। তিন নম্বর ওয়ার্ডের তেতলা ও দোতলায় কোনও উপলক্ষে আসার সুযোগ হলে আমি ঐদিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকেছি। এখন সেই ছবিটি দেখতে পাই সারাদিন। অনশনের ক্লান্তি দূর করায় অনেকখানি সহায়তা করে। একদিন, দুদিন করে তারিখ এগিয়ে চলে। শরীর দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। আমরা শুধু নুনজল পান করতাম। তাতে প্রতিরোধের ক্ষমতা

বাড়ায়। তবু দেহের প্রতিটি কোষ খাদ্যের জন্য কতটা আকুল হয়ে রয়েছে, এক এক সময় বেশ টের পাই। স্বাস্থ্যের কারণে গায়ে মাখার জন্য সরষের তেল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। স্নানের আগে গায়ে তেল মাখার সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষগুলি যেন তা শুষে নিত। বন্ধুদের অনেকে গল্পগুজবের সময় কত রকম সুস্বাদু খাদ্য থাকতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনা করতেন। বাংলার কোন্ অঞ্চলে কি কি রকম মিষ্টি পাওয়া যায়, তার একটা তালিকা তৈরী হয়ে যেত। আমি কখনও ঐ ধরনের আলোচনায় যোগ দিই নি। কিন্তু খাদ্যের জন্য উন্মুখ আকাঙ্খা অবচেতন মনের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতো স্বপ্নে। বেশ কয়েকদিন স্বপ্ন দেখেছি, ট্রেনে করে কোথাও চলেছি। কোনও বড় ষ্টেশনে খাবারওয়ালাকে ডেকে পুরী মিঠাই কিনেছি। মুখে দিতে গিয়েছি, এমন সময়ে সচকিত হয়ে স্মরণ করি, আমি তো অনশন করে রয়েছি। ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখি অন্ধকার সেলে খাটের উপরে শুয়ে রয়েছি।

জোর করে খাওয়ানো শুরু হলো সাতদিন কেটে যাওয়ার পর। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখে, কারা কারা খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমিও ছিলাম সেই দলে। আমাদের ওয়ার্ডে খাওয়াতে এলো ডাঃ শিউকুমার। সঙ্গে কয়েকজন তাগড়া জোয়ান কয়েদী। হাসপাতালের বর্মী কর্মীদের দু-একজন রয়েছে দুধের বালতি, আর নল হাতে নিয়ে। খাওয়াবার আগে সবাইকে সেলে বন্ধ করা হলো। সেলের তালা খুলে জোয়ান কয়েদীদের হাত-পা মাথা চেপে ধরে শিউকুমার নাকের ভিতর নল ঢোকায়, বর্মীটি নলের উপরের কাঁচের "ফানেল"টিতে দুধ ঢেলে দেয়। প্রতিরোধ বেশীক্ষণ টিকবে না জানি, তবু আমাদের পূর্বনির্ধারিত কৌশল অনুযায়ী যতক্ষণ সম্ভব, ঠেকাবার চেষ্টা করলাম। তবে এবার কয়েদী ও ডাক্তারের ব্যবহার অনেক ভদ্র। শিউকুমার যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করে। এমনি করে যাদের যাদের সেদিন জোর করে খাওয়াবার পালা, তাদের তালিকা শেষ হয়ে যাওয়ার পর ডাক্তার সদলবলে চলে যায়। সান্ত্রীরা সেলের তালা খুলে দেয়। বন্ধুরা আবার এসে করিডোরে মিলিত হই। প্রথমবারের অনশনে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা বলেন, এইটুকু সুবিধা সেদিন তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি। সারা দিনরাত একা একা একতলার সেলে বন্ধ অবস্থায় দেহ ও মনের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে।

দুই নম্বর ওয়ার্ডটি তিন নম্বরের ঠিক পিছনে। সেখানে জোর করে খাওয়াতে গিয়েছিল ডাঃ সঙ্গত রায়। খবর আসে আমাদের এক বন্ধু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। তখনই সম্মিলিত দাবী ওঠে, 'সঙ্গত রায়কে দিয়ে জোর করে খাওয়ানো

চলবে না।' পরে অবশ্য জানা গেল, সংশ্লিষ্ট বন্ধুটির কোনও ক্ষতি হয় নি। অত্যন্ত দুর্বল থাকায় ধস্তাধস্তিতে কিছুক্ষণের জন্য অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

শোনা গেল, অ্যাবার্ডীণ দ্বীপে যতটুকু দুধ সংগ্রহ করা সম্ভব, কর্তৃপক্ষ তাই যোগাড় করে এনেছে। বাইরে কর্মরত আরও জনা দুই কয়েদী ডাক্তারকেও আনা হয়েছে, এভাবে কতদিন চালাতে পারবে ?

দিনদশেক পরে জানা গেল, ভারত গভর্ণমেন্ট বেশ কয়েকজন সেনাবিভাগের প্রাক্তন ডাক্তারকে তলব করে এখানে পাঠিয়েছে। সেই জাহাজেই কলকাতা থেকে যথেষ্ট পরিমান গুঁড়োদুধ, নাক দিয়ে খাওয়ানোর নল, ইত্যাদিও আনা হয়েছে। যুদ্ধ ফেরৎ ডাক্তারদের বেশীর ভাগই পাঞ্জাবী। দেখা গেল, তারা খুব ভদ্র। আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিন নম্বর ওয়ার্ডে যাঁরা এলেন তাঁদের মধ্যে এক বৃদ্ধ শিখ ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি সর্দার গুরুমুখ সিংকে খাওয়ানোর সময়ে এক সুযোগে বলে গেলেন, "তুসি জলদি রোটি খা লেওগে" (আপনারা শিগ্‌গিরই রুটি খেয়ে নেবেন, অর্থাৎ অনশন ভঙ্গ করবেন)। কারণটাও জানিয়ে গেলেন। তাঁদের কেন আন্দামানে পাঠানো হচ্ছে, সেকথা আগে টের পাননি। কলকাতায় পেঁছেই দেখলেন, রাজপথে বিরাট মিছিল বেরিয়েছে। তাদের কণ্ঠে বজ্র-নির্ঘোষে ধ্বনিত হচ্ছে, "আন্দামান বন্দীদের ফিরিয়ে আনো, আন্দামান বন্দীদের দাবী মানতে হবে।" হাতে অসংখ্য পোস্টারে ইংরেজী ও বাংলায় একই কথা লেখা। আমরা মনে খুব জোর পেলাম। দেশে সময়মতো খবর পেঁছেছে। জনমত আমাদের সমর্থনে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

মনে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার হয়। দিনগুলি আগের তুলনায় যেন তাড়াতাড়ি কেটে যায়। কিন্তু শরীর যে এক এক সময় বিদ্রোহ করতে চায়। ততদিনে সকলকেই জোর করে খাওয়াবার পালা শুরু হয়ে গেছে। সকাল দশটা থেকে বেলা একটার মধ্যে ডাক্তাররা এসে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে কয়েক আউন্স দুধ ঢেলে দিয়ে যায়। ক্ষুধার্ত শরীর অল্পক্ষণের মধ্যেই তা শুষে নেয়। তারপর চলে দেহের সেই জৈব আকুতি। সন্ধ্যার দিকে পেটের ভিতরটা এক একদিন মোচড় দিয়ে ওঠে। কারো কারো, "হাঙ্গার-পেইন" ওঠে—ক্ষুধার যন্ত্রণা। কথাটি যে নেহাৎ আক্ষরিক নয়, কাব্যিকও নয়, শরীরযন্ত্রের অনিবার্য প্রক্রিয়া, সেকথা মর্মে মর্মে অনুভব করি। তবু তো প্রথমবারের অনশনের তুলনায় অনেক ভাল আছি। সেবার শেষের দিকে কর্তৃপক্ষ বন্ধুদের পানীয় জল দেওয়া বন্ধ করেছিল। ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কর্ণেল বার্কার নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন মীমাংসার কয়েকটি সুনির্দিষ্ট

সূত্র নিয়ে। কিন্তু বন্দীরা হার মানে কিনা, শেষ চাল হিসাবে তা দেখার জন্য চেষ্টা করেন। তাঁরই নির্দেশে জেল-কর্তৃপক্ষ খাওয়ার জল দেওয়া বন্ধ করেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার কালী চক্রবর্তী জল চাওয়ায় তার হাতে দেওয়া হয়েছিল একগ্লাস দুধ। সে ঘৃণাভরে গ্লাসটি সাহেবের গায়ে ছুঁড়ে মারে। শাস্তিস্বরূপ তার হাতদুটি পিঠমোড়া করে হাতকড়ি পরিয়ে জোর করে জোলাপ খাইয়ে দেওয়া হয়। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনেও বন্দীরা হার মানছে না দেখে অবশেষে বার্কার সাহেব মীমাংসার প্রস্তাব করেন।

কয়েকদিন পরই দেশের বিশিষ্ট নেতাদের কাছ থেকে অনশন প্রত্যাহারের অনুরোধ জানিয়ে তারবার্তা আসতে শুরু করে। প্রথমে আসে বাংলার তখনকার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক্ সাহেবের বার্তা। তারপর কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বার্তা। রবীন্দ্রনাথ এবারেও কোনও বার্তা পাঠিয়েছিলেন কিনা, আমার ঠিক জানা নেই। বন্ধুদের মুখে দুরকমই শুনেছি। খবরাখবর পাওয়া, এবং আমাদের জানাবার ব্যবস্থা, ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ছোট সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল। খবর তাঁদের কাছে আসত প্রথমে। তাঁরা পূর্বনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন ওয়ার্ডে জানিয়ে দিতেন। আমরা সকলে মিলে আলোচনার পর আবার তাঁদের জানিয়ে দিতাম। তাই তারবার্তাগুলি সম্বন্ধে আমার যেটুকু জানা আছে, তা পরোক্ষ।

অনশনের শেষের দিকে আসে ওয়াই সত্যমূর্তি, এবং স্বরাজ্য পার্টির আর একজন সদস্যের যুগ্ম তারবার্তা। তাঁরা জানান আন্দামান বন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ভারত গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করে একটি বেসরকারী প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় গৃহীত হয়েছে। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। সেদিন কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারপক্ষের সদস্য হতেন বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এবং সরকারের আস্থাভাজন কিছু মনোনীত ব্যক্তি। সরকারপক্ষ বাধা দিলে কোনও বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং বোঝা গেল, ভারত গভর্নমেণ্টের মনোভাব অনেক নরম হয়েছে। দু-একদিন পরেই আসে মহাত্মা গান্ধীর তারবার্তা। একই দিনে আমাদের দুজন বন্ধুর নামে তারবার্তা পাঠান মুজফফর আহ্মেদ এবং বঙ্কিম মুখার্জী। বঙ্কিম মুখার্জী তখন বাংলার বিধানসভার সদস্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাজিমুদ্দিন আশ্বাস দিয়েছেন, বাংলার বন্দীরা দেশে ফিরে এলে "Uniform Classification" (সকলকে কিছু সুযোগ-সুবিধা সহ একই শ্রেণীভুক্ত করা) হবে।

আমাদের পূর্বসিদ্ধান্ত ছিল, শেষের দুটি দাবী—দেশে ফিরিয়ে নেওয়া এবং

Uniform Classification সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস পেলে অনশন ভঙ্গ করা যেতে পারে। আগে আগে যাঁরা তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের আমরা উত্তর দিয়েছিলাম যে, দাবী পূরণের প্রতিশ্রুতি না পেলে অনশন প্রত্যাহার সম্ভব নয়। এখন নিম্নতম দাবীগুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল। উপরন্তু, মহাত্মা গান্ধীর তারবার্তার একটা বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে।

তারবার্তাদুটি বহন করে এনেছিলেন চীফ কমিশনার মিঃ কস্‌গ্রেভ। তিনি আমাদের প্রতিনিধিদের জেল অফিসে ডেকে পাঠিয়ে ওগুলি পড়ে শোনালেন। মহাত্মা গান্ধীর বার্তায় একটি কথা ছিল, "তোমরা যদি আমার উপরে ছেড়ে দাও, তাহলে আমি তোমাদের জন্য full relief আদায়ের চেষ্টা করব।" (I shall try to secure full relief for you.") 'Relief' কথাটি 'Release' (মুক্তি) বোঝায় কিনা, জানতে চাইলে মিঃ কস্‌গ্রেভ বলেন, "I cannot say what is passing through the brain of that great man". ("সেই মহান ব্যক্তি কিভাবে চিন্তা করছেন, আমি বলতে পারি না। তবে আইনজীবী হিসাবে আমি বুঝি, কেউ যখন মক্কেলের মামলার দায়িত্বগ্রহণ করেন, তখন তার সমস্ত দাবিটিই আদায়ের চেষ্টা করেন।")

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মিঃ কস্‌গ্রেভ ছিলেন আইরিশ। বাংলার জেলে থাকতে দেখেছি, রাজপুরুষদের মধ্যে যারা আইরিশ, তারা বিপ্লবী বন্দীদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের একসময়ের জেলার মিঃ সোয়ানের (Swan) কথা শুনেছি। দুইজন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার, মিঃ লাফ্রে ও মিঃ ব্লুমফিল্ড—দুইজনের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়েছে। ১৯২৭ সালে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বিচারাধীন আসামীরা জেলের ভিতরে আই. বি. সুপারিন্টেন্ডেন্ট মাখন চ্যাটার্জীকে হত্যা করেন। ঐ বন্দীরা ছিলেন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড বলে পরিচিত ওয়ার্ডগুলির একটিতে। এইসব ওয়ার্ডগুলির দায়িত্ব থাকত ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডারদের উপর। তাদের মধ্যে ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের সংখ্যাই বেশী। লাফ্রে এবং ব্লুমফিল্ড ছিলেন আইরিশ। এঁরা ছিলেন মাখন চ্যাটার্জী হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু কিছুতেই সরকারপক্ষে সাক্ষী দিতে রাজী হন নি—শত প্রলোভন এবং ভীতি প্রদর্শন সত্ত্বেও। তখন ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার-দের মধ্য থেকে জেলার পদে প্রমোশন হত। এঁদের দুজনের চাকুরীজীবনে আর সে সুযোগ আসে নি। আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারাধীন থাকা অবস্থায় অত্যন্ত কড়াকড়ির সময়েও এঁদের কাছ থেকে নানারকম সাহায্য পেয়েছি। মিঃ লাফ্রেকে আমি বলতাম, "আপনার উচিত ছিল ধর্মযাজক হওয়া।" এ থেকেই মানুষটি সম্বন্ধে ধারণা করা যেতে পারে।

আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আমাদের প্রতিনিধিরা মিঃ কসগ্রেভের কাছে অনুমতি চাইলেন, সমস্ত অনশনব্রতীকে এক জায়গায় মিলিত হয়ে আলোচনার সুযোগ দেওয়া চাই। অনুমতি পাওয়া গেল। দুই নম্বর ওয়ার্ডের কিচেনের হলটিতে সকলে একত্রিত হলাম। প্রায় একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। শরীর সকলেরই দুর্বল। অথচ দেখা গেল, মনের জোর কমে নি। মহাত্মা গান্ধীর বার্তার উত্তর কি দেওয়া হবে, যতটুকু পেয়েছি, তার ভিত্তিতে অনশন ভঙ্গ করা হবে কিনা, এই নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা চলে। অবশেষে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে সিদ্ধান্ত হয়, এখন অনশন ভঙ্গ করা সংগত। অল্প কিছুসংখ্যক বন্ধুর মত— 'Relief' অর্থে 'Release' বোঝায় কিনা, তা গান্ধীজির কাছ থেকে স্পষ্ট করে নেওয়া উচিত। তাঁরা বলেন, "তোমরা সবাই অনশন ভঙ্গ করো, আমরা কয়েকজন দ্বিতীয় বার্তা না আসা পর্যন্ত চালিয়ে যাব।" সাতজন—সর্দার গুরুমুখ সিং, হাজারা সিং, ডাঃ নারায়ণ রায়, অমলেন্দু বাগচী, রাধাবল্লভ গোপ, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী ও বিজন সেন জানিয়ে দিলেন, তাঁরা এখন অনশন ভঙ্গ করবেন না। একটা দ্বিধায় পড়তে হলো। অথচ রাজনৈতিক এবং অনশনব্রতী বন্ধুদের অনেকের শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে অনশন চালিয়ে যাওয়া সমীচীন হবে না বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলো। দিন সাতেক পরেই মহাত্মাজীর দ্বিতীয় তারবার্তা আসে। সেই তারবার্তার পর ঐ সাতজন অনশন ভঙ্গ করেন। বন্ধুদের কেউ কেউ বলেন, এবার তিনি Release কথাটিও ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু আমার এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নেই। একই সময়ে বাংলার জেলে 'রেগুলেশন থ্রী'তে আটক বিপ্লবী দলের শীর্ষ নেতাদের তারবার্তা আসে। এতে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ ছিল। পরে জেনেছি আমাদের দাবীর সমর্থনে বিভিন্ন শিবিরে বিনাবিচারে আটক বন্দীরাও অনশন শুরু করেছিলেন।

অনশন ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্য পরিবেশনের ব্যবস্থার ভার ডাক্তারদের হাতে দেওয়া হল। এবার কৃত্রিম উপায়ে নয়, স্বাভাবিক উপায়েই তাঁরা খাদ্য পরিবেশন করবেন। সে দায়িত্ব তাঁরা যথেষ্ট সহানুভূতি, এবং সৌজন্যের সাথে কয়েকদিন ধরে পালন করেন। প্রথম রাতে অল্প একটু দুধ পান করে অনশন ভঙ্গ হলো। পরের তিনদিন ডাক্তাররা খাদ্য দিলেন অল্প পরিমাণে, মাপা, দু-একঘণ্টা পর পর। অনশনের পরে খাবার জিনিষ সামনে পেলে যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়, সেটাকে সম্বরণ না করলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, দীর্ঘদিন পাকস্থলী প্রায় খালি থাকায় তার হজমশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিভাবে প্রথম দুই-তিনদিন মাপা মাপা খাদ্য দেওয়া হয়েছে, তার একটা

নমুনা দেওয়া যাক। সকাল সাতটায় সময় কয়েক আউন্স দুধ, দুঘণ্টা বাদে দুধ, এবং "ডবল রোটি।" জানা গেল, পাউরুটি উত্তরভারতে এই নামেই পরিচিত। তার দু'ঘণ্টা বাদে রান্নার চামচের এক চামচ "ক্ষীর" (পায়সজাতীয় জিনিষ)। খাদ্যের স্বল্পতায় কয়েকজন বন্ধু বিরক্তি প্রকাশ করায় ডাক্তাররা বুঝিয়ে দিলেন, আমাদের ভালোর জন্যই এ ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। কেউ কেউ চিকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করে লুকিয়ে অতিরিক্ত খাদ্যসংগ্রহ করেছিলেন। ফলটা প্রায় হাতে হাতেই দেখা গেল। তাঁদের চোখ, মুখ, হাত, পা ফুলে একাকার। শরীরে জলের অংশ বেশী হয়ে গিয়েছিল।

কয়েক দিন পরেই 'কিচেন' পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন আমাদের সেই সব বন্ধুরা, যাঁরা নানা কারণে অনশনে যোগ দেননি, বা যাঁদের যোগ দিতে দেওয়া হয়নি। ডাক্তারদের নির্দেশে প্রায় একমাস খাদ্যতালিকায় পুষ্টিকর উপাদান সরবরাহ করা হয়েছিল।

এবার আসর ভাঙার পালা। জেল-কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি যে জাহাজ আসবে, তাতেই প্রথম দলটি স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করবে। তালিকাও জানিয়ে দেওয়া হলো। এই দলে আছেন পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজের বন্ধুরা। বাংলার যেসব বন্ধুরা অসুস্থ, অথবা যাঁদের মেয়াদ শেষ হতে আর বেশী বাকী নেই, তাঁরাও ঐ জাহাজেই যাবেন। দেশে ফেরার পালা শুরু হল। তবে সেজন্যে আনন্দটা অবিমিশ্র নয়। এতদিন যারা দৈনন্দিন জীবনে সুখ, দুঃখ, কষ্ট এবং লড়াইয়ের অংশীদার হয়ে একসঙ্গে কাটিয়েছি, তাদের বিদায় দিতে দুইপক্ষেই বেদনা বোধ হয়। অন্য প্রদেশের বন্ধুদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে! ভাঙা হাটে 'কিচেন' পরিচালনার দায়িত্ব জেল-কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দেওয়া হলো। সে ভার নিল হেড্ জমাদার লালু সিং। স্বীকার করতেই হবে, সে আমাদের পরিচালনার ধারাটি যথাসম্ভব বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। দৈনন্দিন খাদ্য পরিবেশনে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যদানেরও চেষ্টা করেছে।

ভাঙা হাট হলেও পড়াশুনার নিয়মিত রুটিন আমরা যথাসম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। নিয়মিত ক্লাস না হলেও যৌথভাবে বই পড়া, আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাপ্তাহিক "নিউইয়র্ক টাইম্‌স্" এবং অন্যান্য বিদেশী পত্রিকা পড়ে ইংরাজী অনভিজ্ঞ বন্ধুদের কাছে সারমর্ম বুঝিয়ে দেওয়ার অভ্যাসটিও বজায় থেকেছে। জেলার সাহেবের ছোবল মারার যে ঘটনাটির কথা আগে উল্লেখ করেছি, তা এই সময়েই ঘটে। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, কি কারণে জানি না, উত্তেজিত হয়ে একজন জমাদারের নাকে ঘুষি মারেন। রক্তপাত ঘটে। জমাদারটিকে আমরা সবাই

নিরীহ গোছের মানুষ বলেই জানতাম। জেলার সাহেব অভিযোগ পেয়ে সিপাই-সান্ত্রী পাঠিয়ে প্রাণকৃষ্ণবাবুকে এক নম্বর ওয়ার্ডের একটি সেলে বন্ধ করে রাখেন। তারপর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সামনে হাজির করা হয়। তিনি পনেরো ঘা বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবুর জমাদারকে মারা কেউই সমর্থন করেনি। কিন্তু সেই অপরাধে একজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়া অভাবনীয়, বিশেষতঃ তখনকার পরিস্থিতিতে। যদি সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সমবেতভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাতেন, তাহলে আদেশ নিশ্চয়ই কার্যকরী হত না। অথচ নিতান্ত দুঃখের বিষয়, দীর্ঘ আলোচনার পরও এবিষয়ে একমত হওয়া গেল না। প্রতিবাদও হল না। প্রাণকৃষ্ণবাবুকে যথারীতি 'টিকটিকি'তে (বেত মারার শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে যে যন্ত্রে বাঁধা হয়, তার নাম) বেঁধে বেত মারা হল। এই ঘটনার তাৎপর্য্য নতুনভাবে আমার স্মৃতিতে জাগরূক হয় ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। যখন আমরা ভারতসরকারের আমন্ত্রণে সরকারী ব্যয়ে ও সরকারী ব্যবস্থায় আন্দামানে গিয়েছি। সেলুলার জেলের প্রধান ফটকটিতে প্রবেশ পথের দুপাশে দুটি প্রশস্ত কামরা আছে। ওদুটিকে এখন প্রদর্শনীরূপে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাঁদিকের কামরাটিতে প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের আবক্ষ ফটো, নাম ও অন্যান্য বিবরণসহ টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। ডানদিকের কামরাটিতে সাজানো আছে জেলজীবনের নানা স্মারক, অর্থাৎ যে কাঠের মুগুর দিয়ে যে যন্ত্রটির উপর রেখে নারকেলের ছোবড়া পিটতে হত, ডাণ্ডাবেড়ী, হাতকড়ি ইত্যাদি। এককোণে রয়েছে টিকটিকিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর একটি প্রকাণ্ড মাটির মডেল। হঠাৎ দেখে মনে হয়, ওটি জীবন্ত। ঘুরে দেখার সময় আমার গৃহিণী ছিলেন প্রাণকৃষ্ণবাবুর সামনে। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিপাত করছেন দেখে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলেন, "ওটি আমারই মডেল। কি হয়েছিল, সেকথা আপনার কর্তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন।" ঐ দিনটিতে বিয়াল্লিশ বছর আগে-কার একটি ঘটনার রাজনৈতিক তাৎপর্য্য আমার সামনে বিদ্যুৎচমকের মতো পরি-স্ফুট হয়ে উঠল। রাজনৈতিক বন্দীদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে যে সময়ে গভর্নমেন্টকে পিছু হঠতে হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে শত্রুপক্ষ কিভাবে পাল্টা আঘাত হানতে পারে।

দ্বিতীয় দলটি যাত্রা করবে নভেম্বর মাসে। যথাসময়ে তালিকা জানিয়ে দেওয়া হল। ভাঙা হাট আরও ভাঙল। নভেম্বর গেল, ডিসেম্বর গেল, তৃতীয় দলটি কবে যাবে, তার কোনও হদিশ নেই। স্বভাবতঃই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। আলোচনার পর স্থির হলো, কর্তৃপক্ষকে চরমপত্র দেওয়া হবে। তৃতীয় দল কবে

যাত্রা করবে, সে তারিখ না জানালে আমরা অনশন শুরু করতে বাধ্য হবো। দু-একদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিল, অবশিষ্ট যারা আছে, সকলেই জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের জাহাজে যাত্রা করবে। পরে বিলম্বের কারণ জেনেছি। বাংলার জেলগুলিতে এতগুলি রাজনৈতিক বন্দীর একত্রে স্থান সংকুলান হওয়া কঠিন ছিল। সেইজন্যে দমদমে একটি নতুন কেন্দ্রীয় কারাগার তৈরী হয়েছে। ইংরেজ আমলে দমদম ক্যান্টনমেন্টে গোরা পল্টনদের থাকার জন্য কয়েকটি বড় বড় "ব্যারাক" তৈরী হয়েছিল। সেগুলি এতদিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। এখন তিনটি ব্যারাক, এবং আরও কিছু জায়গা ঘিরে উঁচু পাঁচিল দিয়ে নতুন জেল তৈরী হয়েছে। একধারে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য দশটি তিনতলা "সেলুলার ব্লক" নির্মিত হয়েছে। দেশে ফেরার পর আন্দামান প্রত্যাগতদের অধিকাংশের জন্য ঐগুলি নির্দিষ্ট হয়েছে। বাংলার অন্যান্য কেন্দ্রীয় কারাগারে যেসব বিপ্লবী বন্দীকে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদেরও সবাইকে দমদমে নিয়ে আসা হবে।

যাত্রার দিন ঘনিয়ে আসে। মানুষের মন বড়ই বিচিত্র। দেশে ফেরার জন্য সবাই অধীর হয়ে উঠেছিলাম। অথচ সেলুলার জেলকে ছেড়ে যাওয়ার দিন যত ঘনিয়ে আসে, ততই মন প্রিয়-বিয়োগ ব্যথায় বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। সেলুলার জেলের সঙ্গে আমাদের জীবনের অনেকখানি জড়িয়ে রয়েছে। ইতিহাসের একপর্বের সমাপ্তি, আর এক নতুন পর্বের সূচনা হয়েছে এইখানেই। আমাদের স্মৃতিতে এটা পীঠস্থান হয়েই থাকবে। সেলুলার জেল যে আমাদের প্রত্যেকের মনের কতখানি জুড়ে রয়েছে, সেকথা টের পেলাম দ্বিতীয়বারের পরিদর্শনের সময়ে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয় সন্দর্শনের জন্য আকুতির মতই একটা মনোভাব নিয়ে সেখানে গিয়েছি। প্রাক্তন আন্দামান নির্বাসিত বন্দী মৈত্রী চক্রের নেতারা নামকরণ করেছেন, "মুক্তিতীর্থ আন্দামান।" আমাদের জীবন-সঙ্গিনী যাঁরা সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যেও দেখেছি তীর্থযাত্রীর মতোই মনোভাব। তাঁদের কাছে সেলুলার জেল শুধুমাত্র ইতিহাসের নিদর্শন নয়, তাঁদের জীবনসঙ্গীদের অতীতের বহু স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি।

ব্যক্তিগতভাবে আমিও আন্দামান ছেড়ে আসার আগে যুগপৎ আনন্দ-বেদনার দোলায় দুলেছি। "রস আইল্যান্ড।" কত বিনিদ্র রজনীর নিঃসঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী। দৈনন্দিন বন্দীজীবনের গ্লানির উপরে স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে। আর সামনে আদিগন্ত প্রসারিত সাগরের সুনীল জলরাশি। মুহূর্তেই যেন আমারই জন্য সূর্য্য উঠত দিক্‌চক্রবালে। সাগরের জলে স্নান করে যেন একটি প্রকাণ্ড

ঝক্‌ঝকে তামার থালা অন্তরীক্ষে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে। আমার বন্ধু অমূল্য সেন একটি মাটির টব জোগাড় করে রজনীগন্ধার চারা পুঁতেছিল। চলে আসার ঠিক দুদিন আগে কুঁড়িগুলি ফুটতে আরম্ভ করেছিল। যাত্রার দিন জেলগেট থেকে 'প্রিজন্‌ ভ্যান' এ করে অ্যাবার্ডীন জেটিতে এসে নামি। সেখান থেকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের দোতলায় আমার সেলটি চোখে পড়ে। রজনীগন্ধার সদ্য ফোটা ফুলগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। হাত নেড়ে বিদায় জানাই।

শেষ দলে যারা ছিলাম, তাদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলার বন্দীরা, আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বেশীরভাগ বন্দী, বার্জহত্যা মামলা, লেবং ষড়যন্ত্র মামলার বন্ধুরা, ডাঃ নারায়ণ রায়, প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

এবারকার যাত্রায় তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি। বঙ্কারের চারপাশের সেই বড়ো খাঁচাগুলিতে কম্বলশয্যায় দিন ও রাত্রিযাপন, সকলে একসঙ্গে পংক্তি-ভোজন, সকালে, বিকালে 'ডেক' এ হাওয়া খেতে যাওয়া। জানুয়ারী মাসের বঙ্গোপসাগর শান্ত, প্রায় নিস্তরঙ্গ। কড়াকড়িটা এবার আগের তুলনায় শিথিল। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় সাগরদ্বীপের মুখে জাহাজ নোঙর করে। পরদিন সকালে পাইলট উঠে জাহাজের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করবে। পাইলটের মুখে দুটো খবর শোনা গেল। পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বিহারের বন্ধুরা জেলে অনশন শুরু করেছেন। দ্বিতীয় সংবাদ, বাংলার মন্ত্রিসভা আমাদের সকলকেই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চতুর্থ দিন সকালে জাহাজ কলকাতার ঘাটে এসে পেঁছাল। গ্যাংওয়ে দিয়ে নীচে নামার সময়ে দেখি, আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট আয়োজন। আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট লেঃ কর্ণেল এম. দাস নিজে উপস্থিত থেকে সমস্ত ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করছেন। গঙ্গার ঘাটে অপেক্ষমান বিরাট জনতা। শুধু পুলিশবাহিনী নয়, কলকাতার নাগরিকরাও দলে দলে এসেছেন। "প্রিজন্‌ভ্যান"এ ওঠার সময়ে দেখা গেল, প্রেস ফটোগ্রাফাররা ফটো নিচ্ছেন।

আপাততঃ আমাদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। সেখানে আরেকবার বন্ধুবিচ্ছেদের পালা অনুষ্ঠিত হবে। যাঁরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত, তাঁরা আলিপুর জেলেই থেকে যাবেন। যাঁদের মেয়াদ আরো কম, তাঁরা যাবেন দমদম জেলে। আমিও শেষেরই দলে পড়ব। আলিপুর জেলে পরের দিন বে-আইনীভাবে সংগৃহীত "আনন্দবাজার পত্রিকা" হাতে এল। প্রথমপৃষ্ঠার গোটাটা জুড়ে বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম, "আন্দামান বন্দীদের দেশে প্রত্যা-

বর্তন।" "প্রিজুনভ্যান" এ ওঠার সময়কার ফটোও ছাপা হয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে।

কয়েকদিন পর আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন শরৎচন্দ্র বসু মহাশয়। তিনি তখন বাংলার নবনির্বাচিত বিধানসভায় কংগ্রেস দলের নেতা। সেই হিসাবে বিরোধী দলের নেতা। তিনি আমাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে জেল অফিসে ডেকে পাঠালেন। প্রতিনিধিদলে আমারও থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল। আর যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে গণেশ ঘোষ, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, এবং শচীন করগুপ্তের নাম মনে আছে। কথাবার্তার সময়ে জেলের কোনও কর্মচারী ছিল না। শরৎবাবু জানালেন, "মহাত্মাজী কয়েকদিনের মধ্যেই আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। আলিপুর এবং দমদম দুই জেলেই যাবেন।" তারপর তিনি আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "আপনারা অ্যাণ্ডারসন সাহেবের দাম্ভিক মাথাটাকে নুইয়ে দিতে পেরেছেন। তাঁকে প্রকাশ্যে বলতে হয়েছে, 'I bow down to public opinion.' " ('আমি জনমতের কাছে নতিস্বীকার করছি।')

এর পরের প্রসঙ্গ বর্তমান বইয়ের আওতার মধ্যে পড়ে না। সেলুলার জেলের কাহিনী এখানেই ইতি।

৮

ইতিহাস কথা কয়

ফিরে আসা যাক ১৯৭৯ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে 'হর্ষবর্ধন' জাহাজে। এবারকার যাত্রা তো প্রথম থেকেই জয়যাত্রা।

রাখাল মল্লিক অপরিচিতদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিতে খুব নিপুন। উপরের ডেকে বেড়াতে গিয়ে একজন সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়েছেন। তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন আমাদের 'হল' এ আমার সঙ্গে দেখা করাবার জন্য। জানালেন যে, আমিও সংসদ সদস্য ছিলাম। আপাদমস্তক শুভ্র খদ্দরে সজ্জিত বিহারী ভদ্রলোক। নমস্কার বিনিময়ের পরে বলি, "আমি হলাম ভূতপূর্ব, আপনি বর্তমান।" ভদ্রলোক সেদিক দিয়ে গেলেনই না। বরং বললেন, "আপলোগোঁ নে লড়াই কিয়া। আজাদী হুই। পার্লামেণ্ট বনে। তব্ তো হাম মেম্বার বনে।" অর্থাৎ, "আপনারা লড়াই করেছেন। স্বাধীনতা এসেছে। পার্লামেণ্ট গঠিত হয়েছে। তবে তো আমরা সদস্য হয়েছি।" অপরিচিতের এই ছোট্ট স্বীকৃতির দাম অনেকখানি।

কিছুক্ষণ পরে খবর এল, মন্ত্রী চাঁদ রাম প্রাক্তন আন্দামান বন্দী ও বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবেন। স্থান—সুইমিং পুলের ডেক। অন্যান্য বন্ধুরা গেলেন। আমি আর যাইনি। শুনেছি, সর্দার পৃথ্বী সিং আজাদ মন্ত্রীকে বলেছেন, "আমাদের সঙ্গে একবেলা খানা খাও। আমরা কিরকম খানা খাই, নিজে দেখ।" সেদিন সন্ধ্যায় মন্ত্রী মৈত্রীচক্রের কয়েক-জন কর্মকর্তার সঙ্গে ডাইনিং হলের একটি টেবিলে সান্ধ্যভোজন করেছিলেন। তারপর জাহাজের পার্সার (Purser) অর্থাৎ ভাণ্ডারীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, খাদ্যতালিকার কোনও উন্নতি করা সম্ভব কিনা। ভাণ্ডারী জবাব দেয়, "দৈনিক খরচ বাবদ যে সরকারী বরাদ্দ আছে, তাতে আর এর বেশী হওয়া সম্ভব নয়।" মন্ত্রী অবশ্য একটা কাজ করেছিলেন। কথাছিল যে, পোর্টব্লেয়ারে থাকাকালীন আমাদের সঙ্গীদের প্রত্যেককে খাইখরচ নিজেদের পকেট থেকে দিতে হবে। মন্ত্রী বলেন, "প্রাক্তন বন্দীরা প্রায় সবাই বয়স্ক, এবং কোন না কোন শারীরিক অক্ষমতায়

ভুগছেন। যাঁদের পক্ষে সংগী ছাড়া চলাফেরা সম্ভব নয়, তাঁদের একজন সংগীর খরচটা জাহাজের কর্তৃপক্ষ বহন করবেন।” এতে আমাদের কয়েকজনের কিছুটা খরচ বেঁচে গেল।

৯ই ফেব্রুয়ারী বিকালে সবাই মিলে সুইমিং পুলের ডেকে আসর জমাই। ওখানে অনেকগুলি লোহার চেয়ার সাজানো আছে। ইচ্ছামতো টেনে নিয়ে বসলেই হলো। বন্ধুবর সুধী প্রধান এর সংগে বেশ কয়েকবছর পরে দেখা। তিনি চলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের একটি দলের নেতা হিসাবে। অভিপ্রায়, সমগ্র অনুষ্ঠানের একটি তথ্যচিত্র তৈরীর উপাদান সংগ্রহ। ভারতীয় মহাবিদ্রোহ, এবং 'মোপ্‌লা' বিদ্রোহের যে সমস্ত বন্দীকে আন্দামানে পাঠানো হয়েছিল, তাদের বংশধরেরা অ্যাবার্ডীন দ্বীপের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাদের জীবন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তোলার পরিকল্পনাও আছে। সুধী প্রধান এর সংগে সাধারণ বিষয় নিয়ে গল্পগুজব একসময় আমাদের উভয়ের অজানিতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্বন্ধে আলোচনার দিকে মোড় নেয়। বেশ কিছু সময় কেটে যায়। তারপর আবার আসর জমাই বন্ধুবর কামাখ্যা ঘোষের সংগে। সেলুলার জেলে দীর্ঘদিন একসংগে থাকলেও তাঁর সংগে আমার হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে দমদম্ সেণ্ট্রাল জেলে। ইতিমধ্যে বহুবারই দেখা হয়েছে, তবে এভাবে বসে আলাপ জমাবার অবকাশ কারোরই হয় নি। আমাদের গৃহিনীরা দল বেঁধে এসে হাজির। তাঁরা বললেন, “আমরাও হাওয়া খেতে জানি।” সবাই যখন কথাবার্তায় মগ্ন, তখন কিভাবে জানিনা, হঠাৎ সকলেরই চোখ গেল পশ্চিমদিক্‌চক্রবালের দিকে। আকাশ যেখানে সাগরের জলে মিশেছে, সেই খানে অনেকটা জায়গা জুড়ে যেন আগুনের লেলিহান শিখা। টক্‌টকে রাঙা। বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা সামলে উঠে সবাই বুঝি, সূর্য্য নেমেছে অস্তাচলে। মনে হয়, বিরাট একটা অগ্নিস্তম্ভ সাগরে অবগাহনের জন্য ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। সমুদ্রসৈকতে বসে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখেছি। সেলুলার জেলে প্রায় রোজই সূর্যোদয় দেখার সুযোগ হত। কিন্তু এমনটি কখনও চোখে পড়ে নি। পরের দিন ভোরে তাই প্রায় সকলেই ভিড় জমাই ডেকের উপরে। রাতের অন্ধকার কেবল কেটে গিয়েছে। আকাশে পাণ্ডুর শুভ্রতা। পূর্বদিগন্ত রক্তিমাভায় উদ্ভাসিত। বিরাট অগ্নিগোলক ধীরে ধীরে উপরে উঠছে। গতকাল সূর্যাস্তের সময়ে পশ্চিমাকাশ ছিল বিদায়সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত। আজ অন্ধকারের অপসৃয়মান আবরণ সরিয়ে দিয়ে জ্যোতির্ময় প্রকাশ তুলনাহীন। বর্ণনার ভাষা খুঁজে পাই না। এই জিনিষকে সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নীরবে উপলব্ধি করতে

হয়। "আবিরাবির্মো এধি"—সমস্ত আবরণ ঘুচিয়ে ফেলে প্রকাশিত হও। এই জন্যই কবিগুরু বলেছেন, "তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়।"

গত কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত কথা বলে চলেছি। কাল রাতে শয্যা নিয়েছি দেরীতে। সূর্যোদয় দেখার আগ্রহে জোর করে ঘুমের জড়তা কাটিয়ে উঠে এসেছি। দুপুর থেকেই জেরটা অনুভব করতে থাকি। ভোজন কামরায় গিয়ে দেখি, একটিও আসন খালি নেই। কামরার পিছনের দিকে একটা টিপয়ের কাছে গোটা দুই-তিন চেয়ার ছিল। সেখানে অবসন্নের মতো বসে পড়ি। আমার অবস্থা দেখে খুশু রায় বলেন, "আপনার খাবারটা এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি।" কোনমতে খাওয়া সেরে নীচে যাবো। যত তাড়াতাড়ি পারি বিছানার আশ্রয় নিতে হবে। বহু শুভাকাঙ্খীর মাঝখানে অসুস্থ হয়ে পড়ার একটা বিপদ আছে। সকলেই জনে জনে এসে জিজ্ঞাসা করেন, "কি হয়েছে? আপনাকে কোন সাহায্য করবো কি?" বন্ধুদের উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই। তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ভাবে জবাব দিতে গেলে রোগীর যে কি অবস্থা হয়, সেটা সবাই ভুলে যান। এদিকে আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। হাতের ঈশারায় সবাইকে থামিয়ে দিয়ে নীচের দিকে অগ্রসর হই। এক অনুজপ্রতিম বন্ধু নাছোড়বান্দা। সে আমাকে ধরে নিয়ে বিছানা পর্যন্ত পেঁছে দেবেই। শেষ পর্য্যন্ত বিরক্ত না হয়ে পারি না। বুঝি সে মনে আঘাত পাবে। অথচ তাকে বুঝিয়ে বলারও উপায় নেই।

ইতিমধ্যে পোর্টব্লেয়ার থেকে বেতারবার্তা এসেছে। জাহাজ পেঁছাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা। শুনেছি, এখন আর সেই "চ্যাথাম জেটি" টি নেই। অ্যাবাডীন জেটিকে অনেক প্রশস্ত করে বাঁধানো চত্বর তৈরী হয়েছে। তার একটু পরেই উপরে উঠে গেছে বাঁধানো পাহাড়ী রাজপথ। নতুন নাম হয়েছে হাডুজ "হোয়াফ" (Hadoo's Wharf) সেখানেই সম্বর্ধনা সভার আয়োজন হয়েছে। ঠিক ছিল, জাহাজ বেলা চারটের মধ্যে পেঁছে যাবে। কার্যতঃ দেখা গেল, পেঁছতে পেঁছতে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমাদের কর্মকর্তারা স্থির করলেন, জনসভা সংক্ষিপ্ত করে সেলুলার জেলে গিয়ে সামনের শহীদস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের অনুষ্ঠানটি আজ করতেই হবে। সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, এবং বেতারের প্রতিনিধিরা প্রথম দিনের যা হোক একটা বিবরণ পাঠাতে উদ্‌গ্রীব।

আমি খুশুবাবুকে ডেকে বলি, "এ বেলাটা বিশ্রাম নিতে চাই।" তিনি সেই মত সমর্থন করে বলে গেলেন ডাক্তারকে খবর দেবেন। একবার পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া ভালো। ডাঃ মুখার্জী এসে গেলেন। সঙ্গে সাদা ইউনিফর্ম পরা নার্স। তিনি কেরলকন্যা। ডাঃ মুখার্জী হার্ট ফুসফুস, রক্তের চাপ সবই পরীক্ষা করলেন।

কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে আমার গৃহচিকিৎসক ডাঃ অনিল দে কে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়েই এসেছি। ডাঃ দে অভিজ্ঞ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক। প্রয়াত ডাঃ নারায়ণ রায়ের সহকারী হিসাবে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। আমার হৃদযন্ত্র কয়েক বছর আগে দুবার যখন কর্মবিরতির নোটিশ দিয়েছিল, তখন এঁরই চিকিৎসায় সুস্থ ও কর্মক্ষম হয়ে উঠি।

ডাঃ মুখার্জীর পরীক্ষায় দেখা গেল, রক্তের চাপ কলকাতা ছাড়ার আগে যা ছিল, তা থেকে বরং একটু কমেছে। খুব সম্ভবতঃ সমুদ্রের হাওয়ার দৌলতে। হৃদ্‌যন্ত্র এবং শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া একটু দ্রুত হলেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। ডাক্তারবাবু মত দিলেন, "আপনার প্রয়োজন এখন বিশ্রাম, আর খোলা হাওয়া। এখন তো ডেকে যাওয়ার উপায় নেই। তাই জাহাজের ওয়েলফেয়ার অফিসারকে বলে যাই, পোর্ট হোলটা খুলতে পারি কিনা।" যাওয়ার সময়ে কেরলকন্যা নার্সটি আমার গৃহিনীকে যা বলে গেলেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলে গেলেন, "যাদের আত্মবলিদানের জন্য দেশ স্বাধীন হলো, তাদের জন্য বাংকের ব্যবস্থা। আর যারা কিছুই করেনি, তারা রয়েছে উপরের কেবিনে।"

কিছুক্ষণ পরে ওয়েলফেয়ার অফিসার মিঃ কুলকার্নি এসে হাজির। মারাঠী ভদ্রলোক, খুবই সজ্জন। আচরণে কোনও চেষ্টাকৃত কৃত্রিমতা নেই। আন্তরিকতা আছে। তিনি কুণ্ঠিতভাবে জানালেন যে, পোর্টহোলটা খুলে দিলে হঠাৎ দু' একটা ঢেউ এর জল ভিতরে এসে পড়তে পারে। আমি তাঁকে বলি, "কোনও প্রয়োজন নেই। আমার বিশ্রাম পেলেই হলো।" দেখা গেল, আমরা দুজন জাহাজে থেকে যাওয়ায় ভদ্রলোক আরো একটু বিপাকে পড়েছেন। নিয়ম হলো, জাহাজ নোঙর করার 'পর যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ক্যাপ্টেন সহ অন্যান্য নাবিকেরা সবাই বন্দরে নেমে যান। জাহাজের প্রত্যেকটি কামরা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা সবাই যখন জাহাজে থাকবো, আমাদের ব্যবহৃত কামরাগুলিতে মালপত্র সবই রয়ে গিয়েছে। সেগুলি যাতে খোয়া না যায়, সেইজন্যে মিঃ কুলকার্নি উদ্বিগ্ন। 'হাডুজ হোয়ার্ফ" এ সাধারণতঃ যাত্রী ছাড়া জনসাধারণের প্রবেশ নিষেধ। ঐ দিনটি প্রাক্তন বন্দীদের সম্বর্ধনার জন্য নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছিল। জনতার মধ্য থেকে কৌতুহলী দুই একজন জাহাজের ভিতরটা দেখার আগ্রহে গ্যাংওয়ে দিয়ে উপরে উঠে ভোজনকামরার পাশের সেই প্রশস্ত হলটিতে নেমে এসেছে। মিঃ কুলকার্ণির উদ্বেগ তাতে আরো বেড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে পুলিশ সান্ত্রী মোতায়েনের ব্যবস্থা করলেন। তারপর আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলে গেলেন, জাহাজ বন্দরে ভিড়লে তাঁদের আর জাহাজে থাকতে ইচ্ছা

হয় না। তাই আমার অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য তিনি বাইরে থেকে ঘুরে আসবেন।

ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক বাদে বন্ধুরা ফিরে আসেন। সেলুলার জেল বাইরে থেকেই যাঁরা প্রথম দেখলেন তাঁরা অনেক গল্প করলেন। প্রধান ফটকের সংলগ্ন যে কামরাটিতে আমাদের সবার ফটো টাঙানো রয়েছে, সেগুলি দেখে এসে, যে যারা পরিচিত জনের চেহারাটা কিরকম উঠেছে, তাই নিয়ে আলোচনা করলেন। ফটোগুলো ত' আমাদের সেই বয়সের নয়! মৈত্রীচক্রের প্রচেষ্টার ফলে ভারত সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দান করেন, তার অন্যতম ছিল এটি। চীফ্ কমিশনারের চিঠিতে আমরা প্রত্যেকে কয়েক বছর আগে ফটো তুলে পাঠিয়েছি। সেগুলিকে 'এন্লার্জ' করে টাঙানো হয়েছে।

পরের দিন, অর্থাৎ ১১ই ফেব্রুয়ারী সকালে অনুষ্ঠানটি "অতুল স্মৃতি সংঘ" নামে একটা স্থানীয় সংস্থার পক্ষ থেকে প্রাক্তন বন্দীদের সম্বর্ধনা, আমি, এবং আরো কয়েকজন না যাওয়াই স্থির করি। আসল অনুষ্ঠানটি, অর্থাৎ জাতীয় স্মারক উদ্বোধন হবে বেলা দুটোয়। তার আগে আর অসুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করে লাভ নেই। "অতুল স্মৃতি সংঘ" যাঁর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তিনি ছিলেন পোর্টব্লেয়ারের একজন বিত্তশালী বাঙালী ভদ্রলোক। জাপানী দখলের সময়ে তিনি দখলকারীদের চাহিদামতো অর্থ দিতে অস্বীকার করায় তাঁকে একটি মাঠে প্রকাশ্য স্থানে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গীন উঁচিয়ে সেই অমানুষিক নির্যাতনের দৃশ্য দেখতে বাধ্য করা হয়। গুপ্তচর সন্দেহে জাপানীরা আরও কয়েকজনকে হত্যা করে। তাদের নামগুলি এখন মনে পড়ছে না।

আমি খোলা হওয়ায় বেড়াবার উদ্দেশ্যে সগৃহিনী সুইমিং পুলের ডেকে চলে যাই। জাহাজের ডেক থেকে দেখা যায় সাগরের সেই অর্ধচন্দ্রাকৃতি অংশটি। সামনেই পড়ে "মাউন্ট হেরিয়ট।" তেমনি সবুজ বনে ঢাকা। জাহাজের ঝাড়ুদার ডেক পরিষ্কার করায় নিযুক্ত ছিল। ওটাই "মাউন্ট হেরিয়ট" কিনা, তাকে জিজ্ঞাসা করায় ইতিবাচক উত্তর ত' দেয়ই, স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে দেখায়, ওখানের সমুদ্রতটে একটি সিনেমা হল নির্মিত হয়েছে। তারপর জিজ্ঞাসা করে, "মিনিস্টার হরিয়ানা কা আদ্মী?" আমি জানতাম, চাঁদরাম রোহ্টক কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত, এবং সেটা এখন হরিয়ানা রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত। ঝাড়ুদারটির চোখমুখের ভাবে মনে হল যে, সে আর মন্ত্রী একই রাজ্যের অধিবাসী সুতরাং তার একটু গর্ব করার অধিকার আছে। আজকাল তো

মন্ত্রীদের, তা কেন্দ্রীয়, বা রাজ্য, যে স্তরেরই হোন না কেন, একটা নতুন কৌলীন্য গড়ে উঠেছে। তাঁদের বলা যায় এ যুগের 'নব-ব্রাহ্মণ'। (Neo-Brahmin)।

মন্ত্রীদের কৌলীন্যের আর একটু পরিচয় পাওয়া গেল নীচে নামতেই। পশ্চিমবঙ্গের পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী সগৃহিনী ও সকন্যা এসেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তিনি এসেছেন বিমান যোগে। পৌঁছেই "হর্ষবর্ধন" পরিদর্শনে এসেছেন। সঙ্গে আছেন ক্যাপ্টেন জন ও মিঃ কুলকার্ণি। যতীনবাবু দেখামাত্র উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। প্রশ্ন "আপনি সেলুলার জেলে কবে ছিলেন?" আমি বলি, "১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত।" যতীনবাবু আমার বহুদিনের পুরাণো বন্ধু ১৯৩১-৩২ এর ছাত্র আন্দোলনের সহকর্মী, ১৯৩২ এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহবন্দী। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত উভয়েই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলাম। অতীতের ছাত্র আন্দোলনের সহকর্মীরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বছরে দু'বার প্রীতি সম্মেলনে মিলিত হতাম। সেখানেও বহুবার দেখা হয়েছে শত রাজনৈতিক টানাপোড়েনেও আমাদের প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রয়ে গিয়েছে।

আমাদের সাময়িক বাসস্থানে ফিরে যাবার পর জাহাজের ডাঃ মুখার্জি এসে হাজির। কোন্ দপ্তরের মন্ত্রী, কোন্ পার্টির সভ্য, ইত্যাদি জানতে চান। দেখা গেল, তিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্যের নামটাই বেশী জানেন। আমার কাছে সবকিছু শুনে বললেন, "ননী ভট্টাচার্য্যের পার্টির লোক।" বলতে ভুলে গিয়েছি। সকাল বেলাতেই ক্যাপ্টেন জন, ডাঃ মুখার্জি, এবং মিঃ কুলকার্নিকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমার খোঁজখবর নিয়ে গিয়েছন। আমার অনুরোধে তিনি জাহাজের রাঁধুনীকে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই খাদ্য সরবরাহের সুপারিশ করেছেন, যাতে খাওয়ার পর বিশ্রামের পক্ষে পর্যাপ্ত সময় পাই।

উপরের ডেক হয়ে গ্যাংওয়ে দিয়ে জাহাজ থেকে বাইরে যাওয়া ও ভিতরে প্রবেশের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই। কর্তৃপক্ষ আমাদের সকলকে একটা করে নীলরংয়ের চাকতি দিয়েছিলেন। তাতে লেখা আছে, "ইনঅগারেশন্ অফ্ দি ন্যাশনাল মেমোরিয়াল।" (Inauguration Of the National Memorial)—। জাতীয় স্মারকের উদ্বোধন। ওই চাক্তিটি জামায় আঁটা থাকলে কেউ পথ আটকাবে না। যারা শক্তসমর্থ, তাদের অনেকে এভাবে জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে কাছাকাছি যতটা পারে ঘুরে এসেছে। বাজার থেকে..কেনাকাটাও করেছে। তবে বেশীদূর যাওয়ার উপায় নেই। পোর্টব্লেয়ারে নবাগত পর্যটকদের যেদুটি বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, তার একটি হল পরিবহণ, অন্যটি বাসস্থান।

পর্যটকদের জন্য যে দু'একটি সরকারী বা বে-সরকারী বাসস্থান আছে, সেগুলির ব্যয় সাধারণ মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। যাত্রীবাহী বাস মাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট রুটে যাতায়াত করে। তাও সংখ্যায় বেশী নয়। পাহাড়ী পথে কলকাতার মতো বাদুড়ঝোলা দূরে থাকুক, দাঁড়িয়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই। বসার আসন কয়টি ভর্তি হয়ে গেলেই বাস ছেড়ে দেবে। যারা পড়ে রইল, তাদের অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হবে। আমাদের জন্য কর্তৃপক্ষ গোটাচারেক বাসের ব্যবস্থা করেছেন। সেগুলি পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী পাওয়া যাবে।

মূল অনুষ্ঠানটি হবে বেলা দুটোর সময়ে। রওনা হতে হল কিছু আগেই। বেশীরভাগ গ্যাংওয়ে দিয়েই নেমে গেলেন। যাঁরা বৃদ্ধ ও অসুস্থ, তাঁদের জন্য ডাইনিং হলের পাশের সেই প্রশস্ত হলের অন্যাদিকের দরজা খুলে দেওয়া হল। জেটি এখানে বেশ উঁচু। নামার সময় আর সিঁড়ির দরকার হল না। 'হাডুজ্ হোয়াফ'' ছেড়ে একটু এগিয়েই পথ উপরে উঠেছে। ধরণটা পাহাড়ী পথের। তবে এখানে পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশী না হওয়ায় বাঁকগুলি এত ঘন ঘন নয়। পথের দুপাশের ঘরবাড়ী বেশিরভাগ কাঠের। দু'পাশের, অর্থাৎ একপাশের ঘরগুলি সড়ক থেকে বেশ খানিকটা উপরে, আর সমুদ্রের দিকের ঘরবাড়ীগুলি খানিকটা নীচুতে। শুনেছি, ১৯৪৭ সালের পর থেকে পোর্টব্লেয়ারের অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তুলনা করার কোনও উপায় নেই। আগেরবারত' বাইরে কি আছে না আছে, দেখার প্রশ্নই ওঠে নি। কিছুক্ষণ পরে বাস ডানদিকে মোড় নিয়ে সেলুলার জেলের সামনের চত্বরে থামে। এখানে যে এতবড় চত্বর আছে, তাও আগেরবার ভালভাবে লক্ষ্য করার সুযোগ পাইনি। পূর্বদিকে একটা ঘর রয়েছে। অনেকটা মণ্ডপের আকার। উপরে আচ্ছাদন আছে। নীচেটা সিমেণ্ট বাঁধানো। চারিপাশ খোলা। কয়েকধাপ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। ওখানেই প্রধানমন্ত্রী, রাজ্য-মন্ত্রী এবং চীফ্ কমিশনারের আসন রাখা আছে। প্রাক্তনবন্দী, তাঁদের অতিথি, এবং সাংবাদিকদের জন্য কাঠের চেয়ার সাজানো। পোর্টব্লেয়ারের বিশিষ্ট নাগরিকরাও আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে থেকে শেরওয়ানী, চুড়িদার পায়জামা পরিহিত, মাথায় টুপি, কানে শ্রবণযন্ত্র, এক ভদ্রলোক উঠে এসে, কেন জানিনা, আমাকেই বেছে নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। জানালেন, তাঁদের আদি নিবাস ছিল মেদিনীপুর জেলায়। তিনপুরুষ ধরে এখানে আছেন। ইংরাজী ও হিন্দীতে কথা বলেন, বাংলা প্রায় ভুলে গিয়েছেন। পোর্টব্লেয়ার ভারতের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। নানা রাজ্যের নানা ভাষাভাষী মানুষেরা একত্রে এখানে

বসবাস করছেন। ১৯৪৭ সালের পরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। এ'দের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি মোটের উপর অক্ষুন্ন আছে শুনেছি।

প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় স্মারক উদ্বোধনের পর তাঁর সংগে প্রাক্তন বন্দীদের একত্রে ফটো তোলা হল। জেলের ফটকের সামনে হলেই ভালো ছিল। সেখানে বসার তেমন সুবিধাজনক ব্যবস্থা না থাকায় অন্যত্র বসতে হল। মনে হয় সেখানে একটি দালান ছিল। এখন শুধু ভিতটুকু, আর কয়েকধাপ সিঁড়ি রয়েছে। সেখানেই তিনসারিবদ্ধভাবে ফটো তোলা হল। দেশে ফিরে শুনেছি দূরদর্শনে দেখানো হয়েছিল। তবে দেখার সুযোগ হয়নি। এর পরের কর্মসূচী ছিল, জিমখানা ক্লাব (Gymkhana Club) ময়দানে জনসভা—যুগপৎ প্রধানমন্ত্রী, এবং প্রাক্তন বন্দীদের সম্বর্ধনা সভাও বলা যেতে পারে। চারটি বাসে সকলের একসঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। একদলকে নিয়ে যাবে, তারপর ফিরে এলে আরেক দল। এই অবসরে জেলের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকি। প্রাচীরের ওপার থেকে একনম্বর বাহুটি দেখা যাচ্ছে। হাসপাতালটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফটকের দুধারের স্তম্ভদুটির গায়ে দুটি ফলক লাগানো হয়েছে। একটিতে উৎকীর্ন আছে দেবনাগরী অক্ষরে 'জাতীয় স্মারক', অন্যটি ইংরাজীতে 'National Memorial'।

বাসে জিমখানা ময়দানের দিকে অগ্রসর হতে খানিকটা দূরে গিয়েই চোখে পড়ে "ফোনিক্স বে"র ওপারে সেই পরিচিত "রস আইল্যাণ্ড।" ওটি এখন ভারতীয় নৌবাহিনীর দখলে। নৌবাহিনীর লোকেরাই ওখানে থাকে। "হর্ষবর্ধন" যেখানে নোঙর করেছে, তার কাছাকাছি ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি যুদ্ধজাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানকার মাইকের ঘোষনাও কানে ভেসে আসছে।

জিমখানা ক্লাব ময়দানটি সেলুলার জেলের এত কাছে, জানা ছিল না। ময়দানটি একেবারে সমতল নয়, পাহাড়ের ঢালুর উপরে অবস্থিত। উপর দিয়ে চলে গিয়েছে একটি রাজপথ, আবার নীচে দিয়ে আরেকটি। ময়দানের শেষ প্রান্ত ঢালু হয়ে নীচের রাজপথটির সঙ্গে মিশেছে।

সভায় বক্তৃতা দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, সংসদ সদস্য জ্যোতির্ময় বসু, তারপর প্রাক্তন বন্দীদের পক্ষ থেকে গণেশ ঘোষ। জনসমাগম প্রচুর হয়েছিল।

এরপর স্থানীয় কলেজে একটি সম্বর্ধনার কথা ছিল। কলেজটি নীচের রাজপথের পাশেই অবস্থিত। পরে শোনা গেল, সেটি সময়াভাবে বাতিল হয়েছে। পরবর্তী গন্তব্যস্থল চীফ্ কমিশনারের বাসভবন। সকালবেলাতেই আমাদের কর্ম-

কর্তারা চীফ্ কমিশনারের আমন্ত্রণলিপি সকলের হাতে পেঁছে দিয়েছেন। তাঁর বাসভবনে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের সকলকে সবান্ধব উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। চারটি বাসে প্রথম দলটি চলে গেল। দ্বিতীয়বার বাস আসার প্রতীক্ষায় রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে "রস আইল্যান্ড" এবং সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকি। মনের ভিতরে অনুভূতির তোলপাড়টা ঠিক তখনই টের পেয়েছি, এমন নয়। আমার স্বভাবটা একটু অন্য রকম। প্রতিক্রিয়া শুরু হয় অনুভূতির একেবারে গভীর তলদেশে। উপরে তার সাড়া পেঁছাতে, তথা বহিঃপ্রকাশে দেরী হয়। বিশেষ কোনও মুহূর্তে বিশেষ কোনও যোগাযোগে যেন প্রকাণ্ড একটা ঢেউ হঠাৎ এসে আছড়ে পড়ে। যে মুহূর্তের কথা লিখছি, তখন শুধু চেয়ে দেখছি।

বাস এলো। চীফ কমিশনারের বাসভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হই। অ্যাবার্ডীন দ্বীপটির সামনের অংশটি একটা বিরাট অর্ধচন্দ্রের আকার নিয়ে সাগরে মিশেছে। উত্তরে ও দক্ষিণে প্রসারিত দুই বাহু, মাঝখানটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে সমুদ্র-সৈকতে নেমেছে। সেলুলার জেলটি অবস্থিত দক্ষিণের বাহুর একটি অংশে। চীফ কমিশনারের বাসভবন উত্তরের বাহুর একপ্রান্তে। অ্যাবার্ডীনের সম্মুখের গোটা অংশটিই প্রায় পরিক্রমা হয়ে গেল। চীফ্ কমিশনারের বাসভবনে অনেক রকম গাছপালা রয়েছে। 'লন'টি অত্যন্ত মনোরম। পাহাড় এখানে প্রায় খাড়া-ভাবে সমুদ্রের দিকে নেমেছে। সম্মুখে আন্দামান সাগরের কূলকিনারাহীন জল-রাশি। সম্বর্ধনাটা অবশ্য আনুষ্ঠানিক। তারপর জাহাজে ফেরার পালা। স্থানীয় ক্লাবে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদানের আমন্ত্রণও ছিল। অনেকে সেখানে গেলেন। আবার অনেকে জাহাজেই ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পরে নৌ-বাহিনীর দু'জন উর্দিপরা পদস্থ কর্মচারী এসে উপস্থিত। তাঁরা সেলুলার জেলে আমাদের জীবন কিভাবে কেটেছে, জানার জন্য খুব আগ্রহী। তাদের প্রথম দেখা হলো ডাঃ এস. বি. দাসের সঙ্গে। ডাঃ দাস পাঠিয়ে দিলেন আমার কাছে। আমি যতটা পারি, সংক্ষেপে তাঁদের কৌতূহলতৃপ্ত করি। যাওয়ার সময়ে তাঁরা বলে গেলেন, "বঙ্গাল নে কাফী কুরবানি কিয়া।"—অর্থাৎ বাংলা অনেক আত্ম-বলিদান দিয়েছে। এ স্বীকৃতির মূল্যও তো কম নয়।

ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগ এই দিনটি উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ খাম বাজারে ছেড়েছেন। এককোণে সেলুলার জেলের ছবি। আর খামের গায়ে সাগরের প্রতীক হিসাবে কতকগুলি তরঙ্গায়িত নীল রেখা। একটি করে কপি প্রাক্তন বন্দীদের প্রত্যেককে উপহার হিসাবে দেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তারা বিলি করে গেলেন। নগদ আট আনা দিয়ে অতিরিক্ত একটি সংগ্রহ করা গেল।

১২ই তারিখের প্রধান কর্মসূচী সকালবেলা সেলুলার জেল পরিদর্শন। আমাদের মনের অবস্থাটা যেন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর প্রিয়সন্দর্শনের জন্য উন্মুখ। এবার বাস জেলের সামনের চত্বরে থামার বদলে মোড় ঘুরে পিছনে গিয়ে থামে। একনজরেই বোঝা যায়, যা অবশিষ্ট আছে, তা হল সেলুলার জেলের কংকাল। পিছনদিকের প্রাচীরগুলি নেই। অনেকগুলি বাহু ভেঙে সমতল করে ফেলা হয়েছে। গড়ে উঠেছে গোবিন্দবল্লভ পন্থ স্মৃতি হাসপাতাল। এগিয়ে যাই সেন্ট্রাল টাওয়ারের দিকে। সাতনম্বর বাহুটি এখন স্থানীয় জেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এক নম্বর, এবং সাত নম্বরের মধ্য দিয়ে প্রধান ফটকে যাওয়ার পথ। ছয় নম্বর বাহু বা ওয়ার্ডটি দর্শনীয় স্মৃতিসৌধরূপে সংরক্ষিত। ওয়ার্ডে প্রবেশের ফটকটির দরজার তালা উন্মুক্ত হল। সবাই ভিতরে প্রবেশ করি। ওয়ার্ডের প্রাঙ্গনে সেই 'শেড'টি নেই। সেই অতি পরিচিত আলকাতরা মাখানো টিনের আচ্ছাদন দেওয়া পায়খানাগুলিও নেই। স্নানের হাউদাটিকেও ভেঙে ফেলা হয়েছে। ভারতসরকার এটিকে 'ব্যাচেলর্স্ মেস্', অর্থাৎ অবিবাহিত সরকারী কর্মচারীদের বাসস্থানরূপে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। মৈত্রী-চক্রের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হয়। মৈত্রীচক্রের প্রস্তাব ছিল, ঐতিহাসিক স্মারক হিসাবে বজায় রাখতে গেলে আগে যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই রাখতে হবে। কিন্তু তার আগেই যা ভাঙ্বার, ভাঙা হয়ে গিয়েছে। এখন অবশিষ্ট আছে শুধু উপর থেকে নীচে পর্যন্ত লোহার গরাদে বসানো তিনতলা বাড়ীটি। শূন্য সেলগুলি অতীতের সাক্ষী হিসাবে বজায় রয়েছে। তবু, মৌনতা যে কত সোচ্চার হতে পারে, তা বোঝা গেল আমাদের সঙ্গীদের নানা মন্তব্যে।. সেলগুলি দেখে সান্যালগৃহিণী মন্তব্য করলেন, "আপনারা এখানে ছিলেন কি করে?" ছিলাম কি আর ইচ্ছে করে! থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম বলেই ছিলাম। বয়সটাও তখন কম ছিল। রক্তের জোর ছিল। অনেক কিছু সহ্য করতে পেরেছি। মনে পড়ে মৈত্রীচক্রের পক্ষ থেকে প্রথমবার সেলুলার জেল পরিদর্শন করে ফিরে গিয়ে, আমাদের সভায় বিবরণদানের সময় বঙ্গেশ্বর রায় বলেন, "সেলের বাইরে দাঁড়িয়ে মনে হল, এইখানে কি আমরা ছিলাম।"

সঙ্গীদের কেউ কেউ বললেন, "এ তো খাঁচা"। আবার কেউ কেউ বললেন, "বাঘ-সিংহের খাঁচায় চারিপাশে লোহার গরাদে দেওয়া থাকলেও আলো-হাওয়ার পথ তো বন্ধ হয় না। এই সেলগুলিকে গ্যারেজ, এমনকি অন্ধকূপ বললেও অত্যুক্তি হবে না।" কিভাবে সেলের দরজা বাইরে থেকে লোহার ভারী তালা এঁটে বন্ধ করা হত, তা গৃহিণীদের দেখাই। আমাদের একটি তালার আড়ালে রেখেও

কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে পারতেন না। তাই করিডোরে প্রবেশের পথে, এবং ওয়ার্ডের প্রাঙ্গনে যাওয়ার গেটে আরো দুটি তালা লাগানো হত রাত্রে। সঙ্গী-দের বলি, " 'লৌহকারা', 'পাষাণকারা' প্রভৃতি যেসব কথা শুনেছেন কবি নজরুল ইসলামের গানে, তা যে আদৌ অতিরঞ্জন নয়, সেটা স্বচক্ষে দর্শন করুন।"

ছ'নম্বর ওয়ার্ডের একতলাটিই ছিল আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের প্রধান কেন্দ্র। অনশনের পর মাসখানেক এখানে থেকেছি। সেই সেলগুলির সামনে দাঁড়িয়ে হারানো দিনগুলির কথা স্মরণ করি। তারপর সকলে মিলে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে সেন্ট্রাল টাওয়ারের মাঝের ঘরটিতে গিয়ে পেঁছাই। সেন্ট্রাল টাওয়ারের গোলাকৃতি দালানটির দোতলা-তেতলার মাঝের জায়গাটি কাঠের পাটাতন। দোতলার পাটাতনের মধ্যস্থলে একটা লম্বা টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে সপ্তবাহু সমন্বিত সেলুলার জেলের একটি কাঠের মডেল। চারিদিকের স্তম্ভগুলির গায়ে আটকানো আছে মার্বেল ফলক। সেখানে প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দীদের সকলের নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় যুগেরই। সঙ্গীরা সকলে যে যাঁর পরিচিত নাম খোঁজায় তৎপর হলেন। তার-পর তিনতলা। সেখান থেকে টাওয়ারের ছাদে। দোতলার উপরে আর উঠব না ঠিক করেছিলাম। সে সংকল্প স্থির রাখা গেল না। সেন্ট্রাল টাওয়ারের একে-বারে উপরের অংশে উঠে চারিদিকের দৃশ্য দেখার লোভ সামলানো খুব কঠিন। ১৯৩৮ সালে সেলুলার জেল ছেড়ে যাওয়ার আগে একদিন কিছুক্ষণের জন্য সকলে মিলে উপরে ওঠার অনুমতি পেয়েছিলাম। কিন্তু জেল কতৃপক্ষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ দেখা শেষ না করেই নেমে আসতে হয়। এবার তাই দুচোখ ভরে দেখে নিই। খেসারতটাও সঙ্গে সঙ্গেই দিতে হয়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি বেশ বেড়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তরের যে দলটি মুভিক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঠিক ছিল, আমরা অর্থাৎ প্রাক্তন বন্দীরা সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে নেমে আসছি, সেই অবস্থায় ফটো তোলা হবে। কিন্তু দেখা গেল, ওখানে ফটো তোলার পক্ষে আলোক যথেষ্ট নেই। তখন স্থির হলো, আমরা দুজন করে সারিবদ্ধভাবে প্রধান ফটকের মধ্য দিয়ে সামনের চত্বরে বেরিয়ে যাবো। ক্যামেরাম্যানরা সুবিধামতো জায়গায় দাঁড়িয়ে ফটো তুলবেন। আমি ঠিক করি, একেবারে সব শেষ সারিতে দাঁড়াবো। এই সময়টুকু একটা জায়গায় বসে বিশ্রাম করে নিই। আবার সেই ফ্যাসাদ। শুভাকাঙ্খীরা জনে জনে এসে জিজ্ঞাসা করছেন, "আপনার কি হয়েছে?" "অসুস্থ বোধ করছেন?" প্রত্যেকের প্রশ্নের

জবাব দিতে হলে আমার অবস্থা কাহিল। অগত্যা পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে বড় বড় করে লিখি, "আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। অনুগ্রহপূর্বক কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না।" যাঁরা বিবেচক, তাঁরা বুঝলেন। আবার কেউ কেউ কিছুটা ক্ষুন্ন হলেন। নিরুপায়!

যথারীতি ফটো তোলা হল। সেই মণ্ডপটির সিঁড়ির ধাপগুলিতে বসে আমাদের গ্রুপ ফটোও তোলা হল। পরে শুনেছি, ক্যামেরার রীলগুলিতে কিছু ত্রুটি থাকার দরুণ ফটোগুলো ওঠে নি। এমনকি, জাহাজে ফিরতিপথে ক্যাপ্টেন জন্ এর অনুরোধে তাঁকে, এবং মিঃ কুলকার্ণিকে সংগে নিয়ে আমাদের জনা-দশেকের একটা ফটো তোলা হয়েছিল। তাতে ছিলেন পৃথ্বী সিং আজাদ, পণ্ডিত পরমানন্দ্, গণেশ ঘোষ, বঙ্গেশ্বর রায়, সুধীন রায়, এবং আমি। আর কে কে ছিলেন, মনে নেই। ক্যাপ্টেন জন্ এর অনুরোধে আমাদের নামগুলি তাঁকে লিখে দেওয়া হলো। ফটোর একটি কপি পাওয়ার আশায় ঠিকানাও দিলাম। ফটো তুলেছিলেন একজন সাংবাদিক। সেটিও নাকি ঠিকমতো ওঠে নি। এবারকার আন্দামান যাত্রার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে তিনটি ফটো পেয়েছি কল্যাণীয়া মৃদুলার দৌলতে। সেলুলার জেলের প্রধান ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে তোলা একটি ফটোতে আছি আমি, গৃহিণী এবং নিভাদি। মৃদুলারই আগ্রহে সুইমিং পুলের ডেকের উপরে আরেকটি ফটো তোলা হয়। একপাশে কালী দে, মাঝখানে আমি, তার পর নাতনী, তারপাশে গৃহিণী, এবং নিভাদি। "হর্ষবর্ধন" জাহাজের একটি ফটো সে উপহার দিয়েছে।

সেলুলার জেল পরিদর্শনের পর কর্মসূচীর মধ্যে ছিল দুটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য স্থান দেখা। বাস এবার একেবারে নীচের রাজপথ দিয়ে এসে থামে "করভিন্স্ কোভ্" (Corvyn's Cove) এ। সত্যিই পরম রমণীয় জায়গাটি। সমুদ্রসৈকত খুবই কাছে, কয়েকহাতের মধ্যে। রাজপথটি কিছুদূর এগিয়ে আবার পাহাড়ের উপরে উঠেছে। দুপাশে নারিকেল গাছের ঘন সন্নিবিষ্ট সারি সত্যিই প্রমোদকুঞ্জ রচনা করে রেখেছে। সেখান থেকে যাওয়ার কথা ছিল "সিপ্পীঘাটে।" ঐ জায়গাটিই সমুদ্রস্নানের পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত। আমাদের অনেকে গেলেন। আমরা কয়েকজন ফিরে এলাম।

১১ তারিখ থেকেই প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় ক্লাবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। ইচ্ছে থাকলেও প্রথম দুদিন যাওয়া হয় নি। ১৩ই সকালে প্রাক্তন বন্দীদের প্রধান কর্মসূচী ছিল স্থানীয় বেতার কেন্দ্রে, প্রত্যেকের বিবৃতির টেপরেকর্ডিং। শোনা গেল, বেতারকেন্দ্রটি পাহাড়ের চূড়ায়। বাস যতদূর

যায়, সেখানে নেমে খানিকটা চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে হয়। বন্ধুরা প্রায় সকলেই গেলেন। বেতার ভাষণের লোভ সম্বরণ করি। বিকেলে "করভিন্‌স্‌ কোভ" এ সম্বর্ধনা সভা। সেটিতে যাবো। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও যেতেই হবে। বিগত দুইদিনের কর্মসূচীতে একটা বড়ো ফাঁক রয়ে গিয়েছে অনুভব করি। এখানকার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দূরে থাকুক, তাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার কোনও অবকাশই নেই! তবু যাহোক সম্বর্ধনা-সভায় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যতটুকু যোগাযোগ হয়, তাই ভালো। রওনা হবার ঠিক আগে বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী এসে উপস্থিত। আমরা যে কয়েকজন সকালে যাইনি, তাঁদের ভাষণ টেপরেকর্ডিং করা হবে। বেতারভাষণের চেয়ে জনসংযোগ শ্রেয় বিবেচনায় এবারও লোভ সম্বরণ করি।

'করভিন্‌স্‌ কোভ' এর সভাটি আমার খুব মনঃপূত হয় নি। উপস্থিতদের মধ্যে আমরাই প্রায় অর্ধেক। অন্য যাঁরা তাঁদের দেখে মনে হল সরকারী কর্মচারী, অথবা বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তৃতাগুলিয় তেমন জমে নি। অথচ এই কয়দিনের সংক্ষিপ্ত সময়টুকুতে ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝেছি, পোর্টব্লেয়ারের সাধারণ মানুষের চোখে প্রাক্তন বন্দীদের আসন অনেক উচ্চে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অভাববোধ কিছুটা দূর হলো। উদ্যোক্তারা দুটি নাটিকা মঞ্চস্থ করলেন। প্রথমটি সেলুলার জেলের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্যাতনের চিত্র। রচনা এবং অভিনয় করেছেন বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা। অভিনয় খুবই দরদ এবং নিষ্ঠার সঙ্গে করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালের অনশনের সময়ের ঘটনা। যে শিল্পী জেলার সাহেবের ভূমিকায় নেমেছিলেন, তিনি সত্যিই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে ঘটনা বিন্যাসে সময়টা ওলোট-পালোট হয়ে গিয়েছে। শেষ অধ্যায়ের ঘটনা দেখানো হয়েছে আগে আর প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি ঘটনা, যেমন একজনের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা, এবং উল্লাসকর দত্তের মস্তিষ্কবিকৃতি দেখানো হয়েছে পরে। তবু শিল্পীদের আন্তরিকতাকে স্বীকার করতেই হয়। তাঁরা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কিরকম হয়েছে"? তখন ত্রুটিটুকুর কথা বলতে ইচ্ছে হল না। যেটুকু প্রশংসা প্রাপ্য, তাই জানালাম। দ্বিতীয় নাটিকাটি অভিনয় করে ছাত্ররা। বিষয়টি ছিল জাতীয় সংহতি, দেশের সীমান্তরক্ষার যুদ্ধে জওয়ানদের বীরত্ব, এবং আত্মদান।

১৪ই সকাল দশটায় 'হর্ষবর্ধন' নোঙর তুলে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। ফিরতিপথে একদিন বিকেলে জাহাজের নিয়ম অনুযায়ী "লাইফবেল্ট" পরার মহড়া দিতে হল সকলকেই। প্রত্যেকটি বাঙ্কের শিয়রের কাছে একটি করে "লাইফবেল্ট" ছিল। সেইগুলি নীচে থেকে নিয়ে গিয়ে সুইমিং পুলের ডেকে যাওয়ার

বারান্দাটিতে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হলো। ক্যাপ্টেন সপার্ষদ পরিদর্শন করে গেলেন। ১৯৩৬ সালে যখন বন্দী অবস্থায় আন্দামান যাই তখনও খাঁচার ভিতরে বসে "লাইফবেল্ট পরার মহড়া দিতে হয়েছিল।

১৬ই সকালে ডেকে গিয়ে দেখি, জাহাজ গঙ্গাসাগরের মুখে স্যান্ডহেড্স্ এ পেঁাছে নোঙর করেছে। নীল জলের বদলে ঘোলাজলের ঢেউ জাহাজকে দোলুনি দিচ্ছে। একপাশে নোঙর করা পাইলটের জাহাজ। পাইলট একজন শিখ ভদ্রলোক। ঢেউয়ের দোলুনিতে তার লঞ্চটি "হর্ষবর্ধন"কে প্রায় প্রদক্ষিণ করে একপাশে এসে লাগে। পাইলট দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কিছুক্ষণ পরে জাহাজ চলা শুরু করে। জাহাজের গতি দেখে আশা করা যাচ্ছিল, সন্ধ্যার অনেক আগেই বন্দরে পেঁাছে যাবো। হঠাৎ একজায়গায় জাহাজের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। জানা গেল, জাহাজের তলাটি জলের নীচে নিমজ্জিত একটি চড়ায় আটকে গিয়েছে। সঙ্গীদের মধ্যে যাঁরা একটু অসহিষ্ণু, তাঁরা সর্দারজীর দক্ষতা সম্বন্ধে নানারকম বিরূপ মন্তব্য করলেন। গঙ্গার মোহনার অবস্থা প্রকৃতপক্ষে যে কিরকম, সেকথা তাঁরা জানার বা বোঝার দরকার মনে করেন না। এটাই যেন আমাদের দেশের সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে।

যাইহোক, শেষ পর্যন্ত আবার জাহাজ সচল হলো। নেতাজী সুভাষ ডকে পেঁাছতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। তখন আবার সকলের চিন্তা, ঘরে ফেরার উপায় কি হবে। ওখানে তো ট্যাক্সি বেশী পাওয়া যায় না, বাস চলাচলও খুব কম। বেতারে আমাদের কর্মকর্তাদের কাছে খবর এসেছে, গোপাল আচার্য্য রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যবস্থা করেছেন। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের দুটি বাস শুধু আন্দামান-বন্দীদের নিয়ে যাবে। একটি যাবে শিয়ালদহ ষ্টেশন হয়ে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়। আরেকটি হাওড়া ষ্টেশন হয়ে ঐ পাঁচমাথার মোড়। সেখান থেকে যে যাঁর ব্যবস্থা করে নেবেন। অন্য যাত্রীদের জন্য তাঁদের আত্মীয়স্বজন এসেছেন। আমাদের দুজনের চিন্তা ছিল, মালপত্র বয়ে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে বাস পর্যন্ত যাওয়া কঠিন হবে। এক ভরসা, নির্মলেন্দু যদি জাহাজ আসার তারিখ জেনে নিয়ে জেটিতে উপস্থিত থাকে। জাহাজ ডকে লাগার পর পোর্টহোলের কাঁচের ওপারে দেখা গেল নির্মলেন্দুর মুখ। আমরা দুজনেই আশ্বস্ত হলাম। নির্মলেন্দু যাত্রার দিন আমাদের এই কামরাটি পর্যন্ত এসেছিল। সে গ্যাংওয়ে দিয়ে উপরে উঠে আমাদের কাছে চলে আসে। আবার সেই বিশেষ সিঁড়ি। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে শিপিং কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ক্যাপ্টেন জন, এবং মিঃ কুলকার্নি। তাঁরা আমাদের অভ্যর্থনার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। মিঃ

কুলকার্নি আমাকে দেখে কয়েকধাপ উপরে উঠে নীচে নামতে সাহায্য করলেন। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে বাসে উঠে বসি। বিবেকানন্দ রোড ও চিত্তরঞ্জন আভেনিউ পেঁাছে বাস ড্রাইভারকে অনুরোধ করায় তিনি বিধান সরণী হয়ে শ্যামবাজার যাওয়া ঠিক করলেন। বিধান সরণী এবং বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে বাস থেকে নেমে এলাম।

ফিরে আসি সেই ফ্ল্যাটবাড়ীর তিনতলার ফ্ল্যাটটিতে, যেখানে গত ত্রিশ বছর ধরে রয়েছি। দোতলায় দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আমার দুই শিশু বন্ধু দেবাশিষ ও শুভাশিষ। ওরা যখন কথা বলতে শেখেনি, তখন থেকে আমার সঙ্গী, আমার অসময়ের বন্ধু। ওদের বলে গিয়েছিলাম সমুদ্রের জিনিষ নিয়ে আসবো। আনতে পারিনি। হাডুর রেস্তোরাঁ থেকে দুই প্যাকেট বিস্কুট এনেছি। তাই ওদের হাতে দিই। আমাদের বুক থেকে ব্যাজ দুটি খুলে ওদের জামায় এঁটে দিই। এ যেন একটা প্রতীক। মাত্র দশটি দিন। তার মধ্যে ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় পরিক্রমা করে এসেছি। সেই ইতিহাসের স্বীকৃতির চিহ্ন এঁটে দিই ভাবীকালের বুকে। এরাই তো হবে আগামী দিনগুলিতে তারুণ্যের প্রতিনিধি। অতীতের উত্তরাধিকারকে সঁপে দিই অনাগতের রচয়িতা হবে যারা, তাদের হাতে।